মধ্যবিত্ত

পরিতোষ মজুমদার

পরিবেশক
দে বুক স্টোর
কলকাতা ৭০০০৭৩

সূচীপত্র

পাঁচিল

মিতা চা তৈরিতে ব্যস্ত ছিল রান্নাঘরে। হাত চালিয়ে কাজ সারছে ঠিক কথা কিন্তু ভীষণ যান্ত্রিকভাবে। কারণ এই মুহূর্তে মনের ওড়াউড়িকে কিছুতেই বশ মানানো যাচ্ছে না। কতদিন! কতবছর! অনুভবে আসছে শরীরমনে প্রথম যৌবনের রোমাঞ্চিত হাতের সবুজ স্পর্শ। যেন ও তাকিয়ে আছে রাতের নির্মেঘ নীলাভ আকাশের দিকে। আর স্মৃতির তারাগুলো টুপ্‌টাপ পড়তেই থাকছে। পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে সে আর এখানে নেই। দৌড়ে দৌড়ে পৌঁছে গেছে গঙ্গার পাড়ে কলেজের মস্তবড় সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাঠে। মাঠ ঘিরে বড় বড় অচেনা গাছের প্রাচীর। আন্দোলিত শাখাপ্রশাখার ফাঁক গলে বহতা গঙ্গার ছলছলানি—জোয়ার ভাঁটার খেলা। মাঝে মধ্যে অচেনা বনজ পাখির সুমধুর কলস্বরে তার উপস্থিত বার্তা। ভীষণ নির্ভয় টুনটুটি, দোয়েল, বুলবুলি চড়ুই। বন্ধুর মত ওদের চারপাশে উড়ছে বসছে—খাবার খুঁটে খাচ্ছে। প্রকৃতির অফুরান সমারোহের ভেতর বিগতদিনের কোন বাগানবাড়ি। সেই বাগানবাড়িই ওদের কলেজ।

কলেজের সামনের দিকে বিশাল মাঠ। এক কামিনী গাছের ধার ঘেঁষে ব্যাডমিন্টন কোর্ট। গরমে সে গাছে অফুরন্ত ফুলের মেলা। গঙ্গার হৈ হৈ হাওয়ায় চারদিক উথাল পাথাল প্রস্ফুটিত ফুলের সুগন্ধে। মনে পড়ল মিতার পুষ্পিত গাছটি তার হৃদয় গভীরে সঞ্চারিত করেছিল এক দুর্বার আকর্ষিত মোহ। যেন সে তাকে শিখিয়েছিল জীবন মানে স্বপ্ন জীবন মানে ওড়া।

কোর্টের ধার ঘেষে ছাত্রছাত্রীদের ভীড়। অধ্যাপকদের খেলা দেখত। রজত স্যারের বাঁধা পার্টনার ছিল ইকনমিক্‌সের আশিস সান্যাল। ক্লাস শেষ হলেও যার অভ্যেস ছিল লেকচার চালিয়ে যাওয়া। আশিস স্যারের আসতে দেরী হলে রজত স্যার অমনি ডেকে নিত মিতাকে। সবাইকে শুনিয়েই বলত—খেলাটা ভালই রপ্ত করেছ তুমি। কতক্ষণ আর ওয়েট করব? খেল দেখি।

রজত স্যারের ওকে ডাকা নিয়ে বান্ধবীরা সমালোচনায় সোচ্চার হত—বেশ মনে আছে তার। ওর সামনেই দীপা একদিন বলছিল রঞ্জনাকে—মিতাকে রোজ রোজ ডাকে কেন রে? আমরা কি খেলতে জানি না নাকি?

রঞ্জনা বলে উঠেছিল—জানিস না বুঝি সুন্দরী ভাল খেলে। কালো বেঁটে মোটা মেয়েরা খেলতে জানে নাকি?

এসব ভাবতে ভাবতেই মিতার বিষণ্ন মুখ আলো হয়ে গেল ছেলেবেলার মিচ্‌কি হাসিতে। হঠাৎ করে বয়সের পারা নেমে গিয়ে ঠেকেছে যেন সদ্যকৈশোর পেরোন যৌবনে।

এই কিছুক্ষণ আগে কী অদ্ভুতভাবে মিতার দেখা হয়ে গেল রজত স্যারের সঙ্গে। বাসস্টপে আজ প্রায় পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। বাস আসছিল ঠিকই। কিন্তু এত সুপ্রচুর লোক ঝুলিয়ে যে বাসের কাছে এগোবার কোন চেষ্টাই করে নি সে। রাস্তায় আজকাল একনাগাড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারা যায় না। লোকজনের বিপুল ভীড়ে শূন্যতা যেন আরো বেশী করে চেপে ধরে। তখন নিজেকে সামলানো অসম্ভব বলে মনে হয়। চোখদুটো ভিজে উঠবেই জলের ধারা নামবেই। তাই রাস্তায় বেরোবার নামে ভয়ে শরীর সিঁটিয়ে আসে। না বেরোলে তো চলবে না। কারণ সে জানে তার হৃৎপিণ্ড ঠিক ঠিক শব্দ তুলে চলছে। সেই চলাটা যাতে ডিস্টারবড্ না হয় তাই সে দেবমাল্যর ডেথ্ সার্টিফিকেটের অনেকগুলো জেরক্স কপি করিয়েছে। তাতে গেজেটেড অফিসারের সই সাবুদ নিয়ে তবে যেন শান্তি পেয়েছে। স্বার্থপর আর নীচ মনে হচ্ছিল নিজেকে। বুকের ভেতর দোমড়ানো ব্যথার অনুভব আর হাতুড়ি পেটানোর আওয়াজ। 'শোক' এই ছোট্ট শব্দটার অর্থ যে এত গহীন তা কি জানা ছিল? খেয়াল করে দেখেছে আজকাল প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারই তাকে ভীষণভাবে নাড়া দিচ্ছে। পাশে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধার রাঙ্গানো সিঁথি দেখে মনে হয়েছিল প্রচণ্ড এক সুখের বৃত্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওই বয়স্কা মহিলা। অমনি নিজের সুগভীর শোকের পরিধি দিগন্তবিস্তৃত হয়ে যায়।

এত ভীড় চারপাশে—অথচ দেবমাল্য নেই। ঝপ্ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। চোখ থেকে ভেজা রুমাল সরাতে মিতা দেখল এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক চেনাচোখে তাকে দেখছে। সামান্য অস্বস্তির অনুভব আসতে না আসতেই ভদ্রলোক বলে উঠেছিল—মিতা না? এত বছরের পর্দা সরাতে যা দেরী। ইতিহাসের অধ্যাপক রজত স্যারের চেহারা তেমন পাল্টায় নি। পরিবর্তন নিশ্চয়ই হয়েছে। ছিপ্‌ছিপে শরীর কিঞ্চিৎ ভারী। চুলে সাদার ছোঁয়া। ছেলেমানুষি ভাব অন্তর্হিত। কিছুটা গম্ভীর যেন। মিতার শূন্য দৃষ্টি অর্থবহ হয়ে উঠেছিল।—স্যার? আপনি? এখানে?

—চিনতে পেরেছ দেখছি। চোখে রুমালচাপা ছিল বলে দ্বিধা হচ্ছিল। রুমাল সরাতেই চেনা গেল। চোখ লাল দেখাচ্ছে। ধুলোময়লা কিছু কি পড়েছে?

মাথা নাড়িয়ে সায় দেবার ভঙ্গী করেছে মিতা।

—বেশ রোগা দেখাচ্ছে তোমায়।

—আসলে জীবনের ওপর দিয়ে অনেক ঝড়...স্বর আটকে গিয়েছিল।

এতক্ষণে ছাত্রীর সাদা সিঁথির দিকে নজর পড়াতে রজত বলে উঠেছিল—অ্যাম স্যরি মিতা।

আসলে মিতা কি জানে না রঙ্গীন শাড়ি কপালে টিপ—সে যে একা বোঝা যায় না? বোঝে। কিন্তু শোকে পাথর হয়ে যাবার মাঝেও সাদা পোষাক নিরাভরণ সাজের কল্পনা মনে আনা যায় নি। এখন থেকে তাকে একটা বিশেষ গোষ্ঠির মধ্যে

ফেলা হবে ভাবতে শোক ভেদ করে তীক্ষ্ণ শিহরণ হয়ে গিয়েছিল শিরায় শিরায়। মনকে তৈরি করা হয়েছিল সেই মুহূর্তে। জীবন যত সাদাই হোক রঙ বর্জন করা চলবে না কোনমতেই।

মানুষের ওজনে একদিকে ঝুঁকেপড়া দুশো সতেরো নম্বরের একটি বাস এসে সামনে দাঁড়ালো। রজত হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে বলল—সাতটা বাজে। এখনও কি অবস্থা! ভীড়বাসে আজকাল চড়তে কষ্ট হয়।

হাসল মিতা। —আমারো ঠিক সেই দশা। ভীড়বাসে আজকাল উঠলে দমবন্ধ হয়ে আসে।

—এদিকেই থাকা হয়?

—হ্যাঁ। দমদম পার্ক।

—কী আশ্চর্য। আরে আমিও তো সেখানে যাচ্ছি। এক আত্মীয়ের বাড়ি।

বলবে কি বলবে না ভাবতে ভাবতেই মিতার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল—ওখানেই যখন যাচ্ছেন তখন চলুন না স্যার আমাদের বাড়ি?

মনে হয় খুশী হল রজত বোস—বলছ যখন তখন দেখেই আসি। তবে বেশীক্ষণ বসা যাবে না।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর অন্তত দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া যাবে ভেবে ওরা উঠে পড়েছিল বাসে। আসার পথে অন্য ভুবনের স্বপ্ন মিতাকে নিস্তেজ আর কাহিল করে তুলছিল। অনেকগুলো যদি মিলিয়ে একটা স্বপ্নের সংসার। যদি দেবমাল্য বেঁচে থাকত—যদি দেবপ্রিয় আর পাঁচটা ছেলের মত...যদি আলোঝল্‌মলে সাজানো সংসারটা দেখানো যেত—সে আনন্দ কিরকম উৎসব বয়ে আনত ভাবতে ভাবতেই মিতা কোলাপসেবল গেটের তালা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।

—একা থাকা হয় বুঝি?

তালা খুলে দেয়াল হাতড়ে সুইচ্ অন করতে করতে মিতা বলেছিল—এখনকার দিনে কি কারো বাড়তি লোক আছে যে সে এসে থাকবে এখানে?

—যা বলেছ। সোফায় বসে ঘরের চারপাশে তাকাতে তাকাতে রজত বোস এবিষয় নিয়ে একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিয়ে ফেলেছিল।—সংসার ছোট হতে হতে আর কত ছোট হবে ভেবে তল পাওয়া যাচ্ছে না। সত্যি বলতে কি মামা মামী কাকা কাকী পিসে পিসি এসব দেহধারীদের এখন তবুও দেখা যায়। আর এক জেনারেশন পরে সম্বোধন গুলো শব্দ হয়ে শব্দকোষে স্থান পাবে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যে বিলুপ্তির পথে তা যেন কেউ বুঝেও বুঝতে চাইছে না।

সমাজ বিবর্তনের এই ভয়াবহ দিকটা একসময় মিতাকে ভাবিয়েছে। কিন্তু এখন আকর্ষণহীন বায়বীয় জগতে বসে এসব তত্ত্বকথায় কিছু আসে যায় না মিতার।

রজত বোস মাত্র বছর দুই পড়িয়েছিল মিতাদের। তারপর ডব্লু বি সি এস পরীক্ষায় দারুন রেজাল্ট করে সরকারি চাকরিতে বেশ ভাল পোস্ট পেয়ে অধ্যাপনার

কাজে ইস্তফা দিয়েছিল। এসব খবর লোকমুখে শুনেছে মিতা। আর কিছু জানতে ইচ্ছে হয় নি তার। ততদিনে দেবমাল্যকে পেয়ে উপচে ওঠা জীবনের ছন্দ উপভোগে মশ্‌গুল ছিল সে। মিতা চটপট কাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে বাইরের ঘরে এসে বলেছিল—চা করে আনি।

—আরে বসো তুমি। গল্প করা যাক।

—তা হয় না স্যার। প্রথম এলেন। চা খাবেন না?

ইলশেগুড়ি বৃষ্টিভেজা স্মৃতিমাখা মনে চায়ের ট্রে হাতে বাইরের ঘরে এল মিতা। সেন্টার টেব্‌লে চা রাখতে গিয়ে দেখল রজত স্যার নিবিষ্ট মনে কাঁচের দেওয়াল আলমারিতে তার বইপত্তর খুঁটিয়ে দেখছে। ড্রইংরুমে পুতুল সাজাতে নয় বই রাখার সুবাদে আলমারি তৈরি করা হয়েছিল। দেবমাল্যর উৎসাহকে ঠেকিয়ে রাখা যায় নি।

—চা খাবেন আসুন।

রজত মুখ ফিরিয়ে বলল—দারুন কালেকশন দেখছি।

—ওর উৎসাহেই এত বই। পেশায় এঞ্জিনীয়ার কিন্তু সাহিত্যে দারুন ঝোঁক ছিল ওর।

বাঃ বলে সে রাজশেখর বোস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটো বই হাতে বলে উঠেছে—নিলাম। ফেরৎ দেব। নিশ্চিন্ত থেকো। চায়ে চুমুক দিয়ে রজত বলল—রিটায়ার করার পর কেন জানি না বই পড়ার ওপর খুব ঝোঁক হয়েছে। তবে পুরোনদের মধ্যেই আটকে আছি। আজকাল এই যে আধুনিক গল্পনিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট চলছে—আমি যেন ঠিক হজম করতে পারি না। লেখকরা কী সব প্রচলিত ডান্ট মেনে গল্প লেখেন। অতিরিক্ত বর্ণনা ফ্ল্যাট বিষয় কি লিখছেন ধরতে না ধরতেই খেই হারিয়ে ফেলি। আমাদের ছোট্ট জীবনে কত বৈচিত্রময় ঘটনা ঘটছে অনবরত অথচ...আসল কথা বলব? পুরোন আমলের গল্পের সেই রস সেই আকর্ষণ ঠিক যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য এখনকার জটিল জীবনের সঙ্গে জটিল গল্প মানানসই। সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গল্পে বিবর্তন আসবে এ তো জানা কথা।

রজতের মুখে হালকা হাসি। মিতা বলল—আপনি তো দেখছি জবরদস্ত পাঠক। শুধু পড়েন না সেই সঙ্গে ভাবেনও। তবে আপনার মতামতকে ততটা সাপোর্ট দিতে পারছি না। কত ভালো ভালো লেখা বেরোচ্ছে। একথা ঠিক আমাদের সময় একটা ভাল বই বেরোলে যেরকম হৈ চৈ হত—ঘরে ঘরে হাতে হাতে ফিরত সেসব বই—এখন ভাল বই নিয়ে সেরকম হৈ হৈ হয় না। আনন্দের বিভিন্ন মাধ্যম এর জন্য দায়ী। কেউ কেউ আবার শুধু ইনটেলেকচ্যুয়ালদের জন্য লিখছেন। ভাবি আমি অতটা বুদ্ধিমতী তো নই তাই ভাষার কারিকুরি বা উপস্থাপনার চাতুর্য গ্রহণে অক্ষম হয়ে পড়ি।

চায়ের কাপ রাখতে গিয়ে এতক্ষণে ট্রের ওপর নজর পড়েছে। চেঁচিয়ে উঠেছে রজত। —করেছ কি? এতসব খাবে কে?

—কী এমন দিয়েছি স্যার যে খেতে পারবেন না?

মিতার কথার ঢঙে রজত হেসে উঠল। ডিমে ভাজা পাঁউরুটিতে কামড় দিয়ে বলল—কলেজ স্যোশালে সেই নাটকের কথা মনে আছে?

—চিরকুমার সভা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ তোমরা মেয়েরা মিলে করেছিলে। তুমি পূর্ণর রোলটা—দারুন জমেছিল। আচ্ছা অতবড় চুল লুকিয়েছিলে কি ভাবে? অনেকদিন ধরে স্তব্ধ বাইরের ঘর মিতার হাসির তোড়ে চমকে উঠেছে। নিজের হাসির শব্দে মিতা নিজেও কি চমকায় নি? স্টেজের উজ্জ্বল আলোয় পূর্ণ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মিতা কিরকম যেন কিশোরির মত প্রগলভ হয়ে উঠেছে। —ওঃ সে কি হয়রানি। চুল ফোল্ড করে সার্টের মধ্যে ঢোকানো হয়েছিল। যেমন হেয়ার ড্রেসার! রঞ্জনাটা এক কেলোর কীর্তি করেছিল। অত করে বলা হয়েছিল চুলটা ম্যানেজ করতে পারবি তো? তা বলল—চুপ করে থাক। এমনভাবে আট্‌কে দিচ্ছি যে মেয়ে বলে তোকে বুঝতেই পারবে না কেউ। সামনের ক্লিপ্‌টিপগুলো ঠিকই ছিল। ভেতরে ফোল্ড খুলে সার্টের ফাঁকফোকর গলে চুল বেরিয়ে যাচ্ছে। পাশ ফিরতে পারা যাচ্ছে না। সামনে তাকিয়ে অভিনয় করতে হচ্ছে। নায়িকা নির্মলা মানে সুব্রতার ফিস্‌ফিসানি কানে আসছে—চুল ঠিক কর চুল ঠিক কর।

—বোঝা যায় নি তেমন। গোঁফ লাগিয়ে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল।

ঠিক যেন ম্যাজিক। স্টেজে 'পূর্ণ'র অবয়ব অদৃশ্য হয়। রজত বলল—কোন বই পড়বার ইচ্ছে হলে বলো। যোগাড় করে দেব। শরৎ পাঠাগারের মেম্বার আমি। পদ্মানদীর মাঝি আর রাজশেখর বোসের রচনাবলীর দুটো খণ্ডই বারবার ইস্যু হয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই পাচ্ছি না। তাই নিলাম।

মাথা দুলিয়ে মিতার হঠাৎ মনে হল কত দীর্ঘদিনবাদে সে স্বাভাবিকভাবে হাসছে কথা বলছে। জমাট মেঘের মধ্যে যেন আলোর রেখা। সেই আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই একটা অস্বস্তিজনক ভাবনায় অস্থির হচ্ছিল সে। যা ভাবছিল তাই হল। মিতার দুশ্চিন্তা প্রশ্নের আকারে বেরিয়ে এল রজত বোসের মুখ থেকে—তোমার ছেলেমেয়ে?

সামান্য সময় নিল মিতা। তারপর বলল—এক ছেলে।

—পড়ে না চাকরি করে?

মিতা হ্যাঁ বা না কিছুই বলতে পারে না। আসলে অনুতাপে দগ্ধ হতে হচ্ছে তাকে। রজত স্যারকে আগ বাড়িয়ে ডাকার কি কোন প্রয়োজন ছিল? জানাই ছিল কিছুক্ষণ কথা বলার পর ছেলেমেয়ের প্রসঙ্গ আসবেই। বুকের ধ্বক্‌ধ্বকানির

আওয়াজ কি রজত স্যারের কানে পৌঁছে যাচ্ছে? ঘরের কথা কি বাইরের লোককে বলা ঠিক? সংসারের ঘূর্ণাবর্তে যে ছাই যে ক্লেদ যে শোক জমা হয়েছে তা অপরকে শুনিয়েই বা কি লাভ? দেবমাল্যর সব হারানোর হতাশ দৃষ্টি কি মুছে ফেলা যাবে? এই সেদিনই স্যুটকেসের কোণ থেকে বাবুয়ার লেখা একগুচ্ছ চিঠি পাওয়া গেছে। সাল তারিখ মিলিয়ে সবকটা চিঠি সাজিয়ে রেখেছিল দেবমাল্য। মামার বাড়ি থেকে বাবুয়ার লেখা প্রথম চিঠি—বাবা ও মা তোমরা চিন্তা করো না। ক' দিন বাদে আমাকে দেখতে পাবে। এখানে দারুন মজা। তোমরা আমার প্রণাম আর আদর নিও।

বারবার রবার ঘষেও মোছা যায় নি বাবুয়ার মুখ। বারবার হেরে যেতে হয়েছে। 'নকশাল' শব্দটা সেই বরানগরের ম্যাসাকারের পর দ্রুত মেলাতে শুরু করেছিল না? সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের রাজত্বকালের পর থেকে নকশাল আন্দোলনের ঢেউ স্তিমিত হতে হতে মিলিয়ে গিয়েছিল বলেই তো ধারনা ছিল তাদের। তো বাবুয়া নকশাল শব্দটির গহীন অন্ধকারে ডুব দিয়েছে এমন একটি উড়ো খবর দেবমাল্যর চাকরিস্থল সেই শিল্পনগরীতে পৌঁছে গিয়েছিল। তার সঙ্গে নানারকম খবর টেলিগ্রাম অপেক্ষা দ্রুততর পন্থায় ওদের গোচরে এসে যাচ্ছিল। দূরভাষে বাবুয়া ভরসা দিয়েছে। বলেছে ভিত্তিহীন উড়ো খবরে চিন্তিত না হতে। সুতরাং আতঙ্কের আশঙ্কাকে মাছিতাড়া করেছিল তারা। রিটায়ারের পর কোলকাতায় এলে সব সত্য ফাঁস হল। রাতদিন বাবুয়া কোথায় থাকে কি করে জানা যাচ্ছে না। হঠাৎ হঠাৎ সময়ে অসময়ে তার উপস্থিতি ঘাবড়ে দিচ্ছিল ওদের। লাল লাল চোখ উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। যথাসম্ভব নরম গলায় বোঝাতে গিয়ে তাড়া খেয়েছে মিতা। কেমন অভদ্র গলায় সে বলেছে—আমার কথা আমাকে ভাবতে দাও। তোমরা নাক গলিও না।

বাবুয়া একদিন একটি ক্ষয়াটে চেহারার রুগ্ন মেয়েকে নিয়ে এল। রাগী মুখে মেয়েটি বসেছিল। বাবুয়ার গলার স্বর পাল্টে যায়। সে বলে—আমাদের দলের অ্যাক্‌টিভ সদস্যা। ভীষণ চৌকস। সব দিকে। ওর মত গুণের মেয়ে এপর্যন্ত দেখি নি আমি।

বিবশ মিতা মেয়েটির নাম জিজ্ঞেস করলে সে ঝট্‌পট জবাব দেয়—এতদিনেও আমার নাম জানা বাকি আছে নাকি? বাবুয়ার হুকুমমত চা জলখাবারের আয়োজনে ব্যস্ত মিতার চোখে অন্ধকারের ঢল নেমেছিল। দেবমাল্য অতর্কিত আক্রমণ করেছিল ছেলেকে—শেষবারের মত বলছি দলবাজী বন্ধ কর। সুস্থজীবনে ফিরে এস।

মেয়েটি কথার আগুন ছুটিয়েছিল।—বেশি জ্ঞান ঝাড়বেন না। ক্ষুদ্র স্বার্থে সীমাবদ্ধ আপনাদের মন। সমাজের কল্যাণে আত্মত্যাগের আদর্শ আপনাদের মাথায় ঢুকবে না।

বাবুয়ার হাত চেপে ধরে বলেছিল মেয়েটি—এখানে আসাই ভুল হয়েছে। চল চল।

বেরিয়ে গিয়েছিল ওরা।

আদর্শ এবং বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে রুক্ষ্মভাষী সৌজন্যহীন একটি মেয়ের কি সম্পর্ক থাকতে পারে তা বোঝা যায় নি। তবে 'নক্সাল' শব্দটা যে ভাঁওতা বোঝা গিয়েছিল। চোখের সামনে অসহায় দর্শকের মত বাবুয়ার তলিয়ে যাওয়া দেখতে ওরা বাধ্য হয়েছিল। নরমে গরমে তার ভেতর কোন পরিবর্তন আনা সম্ভব হয় নি। বহুদিন অদর্শনের পর লোকমুখে শোনা গিয়েছে মেধাবী বাবুয়া ভাল চাকরি পেয়েছে। সেই মেয়েটির সঙ্গে তাকে রেস্টুরেন্টে সিনেমায় দেখা যায়।

দুর্বলহার্ট দেবমাল্য ক্রমশঃ পৃথিবীর ওপর কেমন বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছিল। একমাত্র পুত্রের এমন পরিণতির শোক সে সামলাতে পারছে না তা বুঝতে পেরেছিল মিতা। কল্পনার রঙ্গীন ফানুসগুলো চুপ্‌সে যেতে মিতার মনেই কি শান্তি ছিল? তবু দেবমাল্য ছিল তার অবলম্বন। একদিন আলোঝল্‌মল সকালে—আর ভালো লাগছে না। ওপরে যেতে পারলে বাঁচি—বলে কী আশ্চর্য! বসে থাকা মানুষটা শব্দ করে পড়ে গিয়েছিল। চিরকালের জন্য থেমে গিয়েছিল তার স্পন্দন। দেবমাল্যের আকস্মিক মৃত্যুকে মেনে নেওয়া যায় নি, মেনে নেওয়া যায় নি বাবুয়ার তলিয়ে যাওয়া। অনেক প্রশ্ন জেগেছে মনে। তবে কি সঠিকভাবে বাবুয়াকে মানুষ করতে পারে নি তারা? কিছু কি ত্রুটি ছিল? বাবার মৃত্যুর পর যে ছেলের মা'র জন্যে চেতনায় কোন সাড়া জাগে না তাও এমন বয়সে যখন নাকি মনের অনুভূতি কানায় কানায় পূর্ণ থাকে? অঙ্ক মেলানো যায় নি।

—না জেনে তোমার মনে কোন আঘাত দিলাম নাকি? স্পষ্ট বোঝা গেল এতক্ষণ মিতাকে চুপচাপ দেখে স্যার কিছু একটা আন্দাজ করেছে।

বিহ্বলতা কাটিয়ে মিতা বলল—না স্যার। আসলে সে হারিয়ে গেছে। তার সম্বন্ধে কিছু বলার নেই।

—সে কি? খোঁজ কর নি?

—কোন দামী জিনিস হারালে তা সহজে কি পাওয়া যায়?

—দুঃখ করে লাভ নেই। জীবন অত সহজ নয়।

—জানি স্যার। কুহকরানী আশার পিছে, দিনটা ফিরে সর্বদাই। স্বপ্ন কারো সত্য বা হয়, কারো ভাগ্যে বা উঠছে ছাই। সব ক্ষণিকের আসল ফাঁকি, সত্যমিথ্যা কিছুই নয়। মরুর পরে তুষার মত। চিক্‌মিকিয়ে পায় সে লয়।

—বাঃ কোত্থেকে বললে।

—রুবাইয়াৎই ওমর খৈয়াম।

বেশীক্ষণ বসব না বলে রজত বোস সেদিন ঘন্টাদুয়েক গল্প চালিয়ে গেছে। তার সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্য জানা গিয়েছিল। মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে রজতের

স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। তখন ছেলের বয়স নয়, মেয়ের সাত। স্ত্রী মঞ্জুর শখে গাড়ি কেনা হয়েছিল। হেপাটাইটিস 'বি' তে আক্রান্ত হয়ে নার্সিংহোমে যাবার পথে সে সেই নতুন কেনা গাড়িতে প্রথম চড়েছিল। ফের চড়ার সুযোগ হয় নি। গাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছিল রজত। আর কেনে নি। বিয়েও করে নি। তার একার ছত্রছায়ায় ভালই মানুষ হয়েছে ছেলেমেয়ে। দুজনেই আমেরিকায়। ছেলে বিদেশিনি বিয়ে করে সেখানে সেটেল্‌ড। মেয়ের বিয়ে হয়েছে আমেরিকা প্রবাসী এক বাঙ্গালি ডাক্তারের সঙ্গে। সব শুনেটুনে মিতা বলেছিল তাকে—তাহলে আপনি এখানে একা পড়ে আছেন কেন?

—ছেলেমেয়ের অনুরোধে থাকতে গিয়েছিলাম। সবাই চাকুরে। এমনিতে গৃহবন্দী। বাইরে বেরোলে খট্‌মট করে ইংরেজী বলা পোষালো না। আসলে ভেতো বাঙ্গালি স্বভাবটাই আমাকে দেশে ফিরিয়ে এনেছে।

দীর্ঘদিনবাদে অচমকা পুরোন বন্ধু বা চেনালোকের সঙ্গে দেখা হলে এসো কিন্তু। তুমিও এস—এধরনের প্রতিশ্রুতিমূলক কথাবার্তা হয়েই থাকে। সংসারের ঘূর্ণীচক্রে সেসব প্রতিশ্রুতি উভয়পক্ষই ভুলে যায়। এক্ষেত্রে রজতের আসা যাওয়া অব্যাহত থাকল। মনে হয়েছে মিতার, দুজনের জীবনের এক বিশেষ শূন্যতা হয়ত ওদের কাছাকছি এনে দিয়েছে। শিক্ষক ছাত্রীর প্রভেদ ঘুচে গিয়ে তাদের মধ্যে যে ক্রমশঃ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠছে তা ভালই বোঝা যাচ্ছে। বাংলা মিডিয়ামে পড়া ছাত্রীকে ইংরেজী বই যুগিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে রজত। এইচ. জে. ক্রোনীনের সিটাডেল পড়েছ? অ্যান ফ্র্যাঙ্কের ডায়রী, দ্য লাইট হাউস? জুলে ভার্ন, আগাথা ক্রিস্টি জলের মত সোজা ইংরেজী। পড়ে দ্যাখোই না—ভাল লাগবে। নিঃসঙ্গ মরুভূমির ভেতর রজত বোস যেন ওয়েসিস। ভদ্রলোকের জন্য মনের ভেতর কোথায় যেন মমত্ববোধ সঞ্চারিত হয়। সেই অনুভবের তাগিদে রজতকে মিতা একদিন দুপুরে খাবার আমন্ত্রণ জানাল। মিষ্টির বাক্স হাতে সেদিন এসেছিল রজত। খুশিখুশি মুখ। ছ'চেয়ারে সাজানো টেবিলে পরিপাটি করে খাবার পরিবেশন করেছিল। রজতের অনুরোধে সেও বসেছিল। তৃপ্তমুখে রজতের খাওয়া দেখতে দেখতে মিতা বুঝতে পারছিল সবকিছু তার মুখে বিস্বাদ ঠেকছে। এক ঘন কুয়াশার আবরণ কেন যে সর্বক্ষণের জন্য ঘিরে আছে তাকে? চেষ্টা করেও বেরিয়ে আসতে পারা যাচ্ছে না। এই আবদ্ধভাবই তার দিনরাতের যন্ত্রণার উৎস তা কি মিতা জানে না? আমিষ নিরামিষের প্রভেদ ঘুচিয়ে রঙ্গীন শাড়ি পরে তার বৈধব্যের যন্ত্রণা বা বাবুয়াকে হারানোর দুঃখ কি ভোলা যাচ্ছে? আসলে ওরাই তো তার সব আনন্দ সব প্রেরণার উৎস ছিল তা পলে পলে অনুভূত হচ্ছে। মনে পড়ে যায় ছুটির মরসুমে শিল্পনগরীর সেই বাংলো কচিকাচা বয়স্কদের রিহার্সালে কিরকম সরগরম থাকত। ঠাট্টা শুনতে হয়েছে দেবমাল্যর—বয়স বাড়ছে ছেলেমানুষি কমছে না। মনের সজীবতাকে ক্ষুণ্ণ

করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে কি ছিল তার? অথচ সবকিছু কেমন ওলটপালট হয়ে গেল। আজকাল ওলটপালট ভাবনার জ্বালায় অস্থিরতা বেড়েই চলেছে। নারীস্বাধীনতা, সংস্কারের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসা, তসলিমা'র 'নির্বাচিত কলাম' কী হিন্দু কী মুসলিম নারীর ব্যক্তিসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার আপ্রাণ প্রয়াস—একবিংশ শতাব্দীর আসন্ন পদক্ষেপে এসব গালভারী কথা, আলাপ আলোচনা বিচারবিশ্লেষণ মাঝে মাঝেই কেমন ধোঁয়াটে বিবর্ণ ঠেকে। কোথা থেকে সামনে এসে যায় অদৃশ্য পাঁচিল। দেবমাল্য চলে যাবার পর নানা অভিজ্ঞতা ওকে বুঝিয়ে দিয়েছে সমাজের ভেতর বয়ে চলেছে কুসংস্কারের চোরাস্রোত। দিদির মেয়ের আইবুড়ো ভাতের অনুষ্ঠানে তাকে আর তার দিদির সাদাসিঁথি জা'কে নিচের তলায় মুখোমুখি বসে থাকতে হয়েছে। ওপরে তখন শাঁখের আওয়াজের সঙ্গে আনন্দানুষ্ঠান হচ্ছে। জানে মিতা এই বিশেষ গোষ্ঠির বরণডালা ধরবার বা সাধের অনুষ্ঠানে যোগ দেবার অধিকার নেই। এখনও নিমন্ত্রণ বাড়িতে 'বিধবা'দের আসন সংরক্ষিত থাকে। জীবন থেকে শুভ কথাটি বাদ দেবার কী আপ্রাণ প্রয়াস!

নেমন্তন্ন খাবার দিনপনেরো বাদে রজত এল। একথা সেকথা বলার পর সামান্য দ্বিধা আর সঙ্কোচ মিলিয়ে বলে উঠেছিল,

—অত যত্ন করে খাওয়ানো হল আমাকে—অথচ ইচ্ছে থাকলেও তোমাকে রান্না করে খাওয়ানো সম্ভব নয়।

—রিটার্ন পাবার আশায় কি আপনাকে খাইয়েছি?

—না না সেকথা নয়। আমারও তোমার জন্য কিছু করতে ইচ্ছে হতে পারে। সিনেমার টিকিট কেটেছি। ইংরেজী রূপকথার বই।

দূর অতীতে এক বর্ষামুখর সন্ধ্যার স্মৃতি বিদ্যুৎচমকের মত দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। ভাবে মিতা নির্দোষ বই দেখাতে আপত্তি থাকার কথা নয় বলেই কি রজত 'রূপকথা' শব্দটির উল্লেখ করল? মিতার উচ্ছ্বাসহীন সংযত স্বর শোনা যায়—কোন শো এর টিকিট?

—দুপুরের। রাত্রে খাবার ব্যবস্থা রেখো না। ফেরার পথে ধোসা খাওয়া যাবে।

—দেরী হয়ে যাবে না?

—পৌছে দেব।

শব্দ করে হেসে উঠেছে মিতা। হাসিমুখেই বলেছে—সে বয়স আর নেই।

পরদিন সবকাজ তাড়াতাড়ি সারতে লাগল মিতা। এখান থেকে অনেকটা দূর 'মেট্রো'। এক অদ্ভুত উত্তেজনা পেয়ে বসেছে তাকে। ঠিক এধরনের অনুভূতির সঙ্গে তার যেন পূর্ব-পরিচয় নেই। ঘোরে ঘোরেই একসময় মেট্রোর সামনে উপস্থিত হয়েছে। দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এল রজত বোস।

পর্দার ওপর ছায়াবাজী। ভয়ানক অন্যমনস্ক থাকার দরুণ ছবিগুলো অস্পষ্ট। শেষ কবে সে দেবমাল্যর সঙ্গে সিনেমা দেখেছিল যেন? রজত ইন্টারভেলে উঠে

গিয়ে পট্যাটো চিপ্‌সের প্যাকেট নিয়ে এল। চিপ্‌সের প্যাকেট এগিয়ে দিতে দিতে বলেছে—বইটা ভালই। কি বল?

আচমকা মনে হল মিতার, তার দুঃখের জগৎটা কি পাল্টে যাচ্ছে? জীবনের মানে হারিয়ে গিয়েছিল এখন যেন কেউ সেই জীবনের মূল্য মাপছে। নিরেট অন্ধকারে অনেক আলোর চক্‌মকি। তারা কি তাকে হাতছানি দিচ্ছে? শীততাপনিয়ন্ত্রিত হলে বসেও গরম লাগছে। সমস্ত শরীরে ঝিম্‌ঝিমানি। মনের ভেতর এত কিসের উথালপাথাল? চেতনায় ফিরে এল। রজত বোসের সঙ্গে এতটা মেলামেশা কি ঠিক হচ্ছে? অতটুকু বয়সে সিনেমা দেখানোর অফার প্রত্যাখ্যান করেছিল। এখন বয়স বেশী বলে কি আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে? যুবক বয়সে রজত বোসের মুগ্ধ দৃষ্টির কথা ভুলে গেল কিভাবে! আর না। নিজেকে এবার সরিয়ে নিতে হবে।

এতসব ভেবেও অভদ্র হতে বেধেছিল। বাধ্য ছাত্রীর মত রেস্টুরেন্টে ঢুকেছিল মিতা। চামচ দিয়ে সম্বরা ঘাটছিল রজত কিন্তু তার দৃষ্টি স্থির মিতার মুখের ওপর। কিছুটা বাধো বাধো স্বর। বলল সে—ফেলে আসা দিনগুলো বড্ড মনে পড়ছে। মিতা নিজেও বুঝতে পারছিল স্মৃতির জালে সেও আটকা পড়ছে। জীবনের পরিণতি হয়ত অন্যখাতে বইত। অথচ এতদিন ধরে রজত স্যারের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোন স্মৃতি তাকে আলোড়িত করে নি কেন বুঝে উঠতে পারা যাচ্ছে না। আজকের ভিন্নতর পরিবেশই কি এর জন্য দায়ী?

—সেদিন তুমি রাজী থাকলে—সামান্য থামল রজত। তারপর বলল—আমরা দুজনেই কিন্তু বেঁচে আছি। আমাকে কেন যে তোমার ভাল লাগে নি সে প্রশ্ন আজও আমাকে হিট্ করে।

বিষণ্ণ হাসি হাসল সে—দেখতে কি আমি এতই খারাপ ছিলাম? সিনেমার টিকিট ফেরৎ দিয়েছিলে মনে আছে?

রেস্টুরেন্টের কাঁটাচামচের শব্দগুলো ভয়াবহ, যেন বোম ফাটছে। কেন রজত বোস তাকে টোপ ফেলে এখানে নিয়ে এসেছে বোঝা যাচ্ছে। বেশী বয়সের এসব আখ্যান গল্পের মজা নিয়ে শোনা ছিল। রক্ত জমা হচ্ছে মুখে। আর নয়—কড়া কড়া শব্দসমষ্টি গোছাতে ব্যস্ত হল মিতা।

রজত বোসের মুখ থামে নি। ধোসা চিবোতে চিবোতে সে বলে চলেছে—বলছিলে না সেদিন, চলার পথে মাঝে মাঝে উঠে যায় অবরোধের পাঁচিল। ইচ্ছে করলে সে পাঁচিল তুমি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিতে পার। রাগ ঘেন্না দুটো অনুভূতি মিলেমিশে আচ্ছন্ন করে ফেলল মিতাকে। আধখাওয়া ধোসার প্লেট সরিয়ে রাখল। রুমাল বার করে মুখ মুছে নিল। বুঝিয়ে দিতে হবে পাঁচিল ভেঙ্গে দেবার বিন্দুমাত্র শখ তার নেই। ঠিক কেমনভাবে কি বলা যাবে ভাবতে ভাবতেই বন্ধুভাবাপন্ন রজত বোসের গলার মাষ্টারি সুর শোনা গেল।

—আচ্ছা মিতা কলেজ ম্যাগাজিনে তুমি গল্প লিখতে না?

ভয়ানক অবাক মিতা বলল—হ্যাঁ।

—তোমাদের শিল্পনগরীতেও কি একটা ম্যাগাজিন বের করেছিলে না?

—হ্যাঁ স্যার—প্রতিবিম্ব।

—হ্যাঁ হ্যাঁ তাতে লেখা তোমার একটা গল্প পড়েছি।

তা চর্চা কি পুরো বন্ধ করে দিয়েছো?

খুব ধীরে ধীরে যেন স্বগতোক্তি এভাবেই মিতা বলল, চর্চা? একেবারে বন্ধ।

—একটা কথা বলতেই হচ্ছে। শোকের খোলস ছেড়ে এখনও তুমি বেরিয়ে আসতে পারনি। গীতায় কি লেখা আছে জান? অজ্ঞানেরা শোক করে। ভগবানের এ নিয়ম মাথা পেতে নিতেই হবে। জীবন অমূল্য তা কি নতুন করে বোঝাতে হবে? তোমার হাতের মুঠোয় এখনও অনেক ক'টা বছর। বইয়ে দিও না। কাজে লাগাও। চর্চা চালিয়ে যাও। দেখবে আপনা থেকেই অবরোধের পাঁচিল সরে গেছে।

রজত বোসের খাওয়া শেষ। আজ তাকে কথায় পেয়েছে। মুখ মুছতে মুছতে আবার বলতে থাকে—জীবনের আর এক নাম যুদ্ধ। যুদ্ধ না করেই হেরে গেছি বলে বসে থাকার কোন অর্থ হয়: এজগতে আমরা সবাই একা মিতা। একা তো হয়েছেটা কি?

শতেক শব্দের মধ্যে রজতের গুনগুনানি কানে আসছে—যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলোরে। ...ভয়, ভাবনা, অস্বস্তি, আশঙ্কা মুছে যাচ্ছে। এসময় সামান্য বিষাদমাখা রজতের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—সামনের মাসে আমেরিকা যাচ্ছি। ছেলেমেয়ের উৎপাতে টেঁকা যাচ্ছে না। দেখি চেষ্টা করে সেখানে পার্মানেন্ট থাকা যায় কি না।

ঘাড়ে তোয়ালে ফেলা রেষ্টুরেন্ট বয় প্লেট কাঁটা চামচ তুলে নিল। টেবল মুছে কাঠিগোঁজা মৌরির প্লেট রেখে গেল। চারপাশে বিচিত্র মশলার গন্ধ। এ সময় উপচে পড়া ভীড়। খাদ্যরসিকরা টেবল দখলের অপেক্ষায়। চোখের সামনে সব দৃশ্য আপাততঃ অদৃশ্য। বুকের ভেতর উষ্ণ প্রস্রবন। রজত স্যারকে ভুল বোঝাব জন্য কিছুটা অনুতপ্ত ব্যথার অনুভব। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে ফলফুলশোভিত জীবনরূপী গাছের আন্দোলন ওকে ভয়ানক প্রলুব্ধ করে তুলছে। এই মুহূর্তে বিহ্বল মিতা এক স্বপ্নময় জগতে আপন উপস্থিতি ভালমত টের পাচ্ছে।

সওয়ারী

কাজ সেরে গেটের বাইরে আসতেই বেন্দাকে দেখতে পেল মীনা। বেন্দা রায়েদের পাশের বাড়িতে কাজ করে। মীনাকে দেখে কালো ছোপধরা ভাঙ্গাচোরা দাঁত বার করে একগাল হাসল বেন্দা। বলল—ও তুমিই তালি রায়বাড়িতে কাজ ধরিচ ? টিকতি পারবা না। একগুচ্ছির লোক। মণ মণ বাসনের গাদি।

পিচ কেটে থুতু ফেলল বেন্দা। মীনা চুপ। সে বেন্দাকে পাশ কেটে দ্রুত এগিয়ে গেল। মাত্র দিন দুই হল সে রায়বাড়িতে কাজ ধরেছে। এর মধ্যে যে দুচারজন কাজের মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে সবাই যেচে এসে তাকে একই উপদেশ দিয়েছে। ঘাবড়ে যায় নি মীনা। ভেবেছে দেখাই যাক না টিকতে পারা যায় কি না। বাড়ি বাড়ি বাসনমাজা উড়ুখুড়ু উকুনভর্তি চুল, হাতে হাজা পায়ে হাজা কাজের এই মেয়েগুলোকে মীনা দুইচোখে দেখতে পারে না। মীনা ভালই জানে কেউ ওর সমগোত্র নয়। তবু যে কেন যেচে কথা বলতে আসে ওরা। খেয়াল করে দেখেছে দলে ভারী থাকলে ওরা মীনার সাজনগোজন ধোপদুরস্ত চেহারা নিয়ে ফিসিরফাসুর করতে থাকে। তাতে কিছু এসে যায় না মীনার। আসলে কিছুতেই নিজের নজরকে নিচু করতে পারা যায় নি। এতদিনেও।

পতঙ্গ যেমন আলোর দিকে আকৃষ্ট হয় তেমনি রায়েদের বাগানসুদ্ধ বাড়িটা ওকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করেছিল। খেয়াল করে দেখেছিল এই উঁচু পাঁচিলঘেরা বাড়িতে আম, কাঁঠাল, নারকোল, সুপারি নানা গাছের সমারোহ। টাউনশহরে এরকম বাড়ি দেখা যায় নাকি? বুকের ভেতর এক অদ্ভুত আনন্দকম্পনের অনুভবে কাহিল হয়েছিল মীনা। দ্বিধা আসেনি। এবাড়ির বড়বৌ শর্মিলার সব সর্তে এককথায় রাজী হয়ে গিয়েছিল।

সকালের নরম আলোয় নারকোল সুপারি গাছের মাথাগুলো ঝল্‌মলে। সাতরকম পাখির কিচিমিচি এই সাতসকালে। উঠোনের সানবাঁধানো চত্বরে ঘসর ঘসর শব্দ তুলে বাসন মাজছিল মীনা। বাসনের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে চোখ চলে যায় ফলন্ত গাছগুলির দিকে। থোকা থোকা ফলে আছে নারকোল সুপারি। কাঁঠাল গাছের নিচে থেকে ওপরে দানাদার কাঁঠালের সারি। একগাদা কাক এখন মীনার চারপাশ ঘিরে নিঃশব্দ। ওদের তির্যক দৃষ্টি এঁটো বাসনের দিকে। ভাত বা মাছের কাঁটা ঠোঁটে নিয়ে এধার ওধার নিরাপদ দূরত্বে উড়ছে বসছে।

মীনা ভাবতে থাকে পুরোন কথা। কোন সুখ বা বেদনা বিধুর স্মৃতির আচমকা স্পর্শ মীনাকে ক্ষণিকের জন্য উদাস করে তোলে। ফেলে আসা সেই বাংলার

সুপারি নারকোল আর পাখ-পাখালির চেহারা তো এক। ওদের জাত নেই। ওদের দেশ ভাগ হয় না। যেখানে জন্মাবে সেখানেই ওদের নীরব অধিকার। বুকের ভেতর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। একটা মোচড়ানো ব্যথা ঢেউ খেলে যায়। ফলপাকুর ঘেরা সেই বাড়িটা কেন যে হারিয়ে গেল। ভাইবোনের সঙ্গে ছুটোছুটি করে কেমন জমাটি খেলা। সন্ধ্যেবেলা আঁচল জড়িয়ে তুলসীমঞ্চে মায়ের প্রণামের ভঙ্গী ছবি হয়ে সেঁটে আছে বুকের গভীরে। স্রোতে ভাসা মীনা অন্যমনস্ক হয়। বাসনমাজার শব্দ ছাপিয়ে ওর গান শোনা যায়। ঘাড় নিচু করে আপনমনে গাইছে মীনা —ও শারদসুন্দরী বরষা ভীষণ। আমার জীবনে একি ঝড়েরই মাতন ....

তা সেসময় এবাড়ির ছোট মেয়ে রিনটিন কাঁধে তোয়ালে হাতে জামাকাপড় নিয়ে বাথরুমে ঢুকতে যাচ্ছিল। ঢোকা হল না। দাঁড়িয়ে পড়ল, গান শুনে। অদ্ভুত সুরেলা গলা তো! তাকিয়ে দেখল। নতুন কাজের মেয়ে। কিছুটা অবাক হল। ট্রেনটা মিস্ হবে হয়ত ভেবেও রিনটিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর গান শুনতে থাকে। ঘরে না বাহিরে আছি। কোথায় যে ভেসে গেছি। ঝড়ে জলে একাকার আমার জীবন....

গান শুনতে শুনতে রিনটিন আজ অনেকদিন পর সকাল দেখল। ট্রেন ধরার তাড়ায় চোখ মেলে সকাল আর দেখা হয়ে ওঠে না। উঠোনে হাল্কা রোদ। কাক চড়ুই এর মেলা। পেয়ারা গাছের ডালে এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে ক'টা টুনটুনি ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ উড়ছে বসছে। কাজের মেয়েটির দিকে চোখ রাখল। কী নাম তোমার?

এ বাড়ির দিদিমণির নরম গলা শুনে তার গান থেমে যায়। সলজ্জে তাকায় রিনটিনের দিকে। তারপর বলে—মীনা।

—চমৎকার গানের গলা তোমার। আমি তো ভেবেছিলাম রেডিও বা টি.ভি.তে হচ্ছে বুঝি।

মীনার কুচকুচে কালো সিন্দুর কাজল শোভিত মুখখানা হাসির ছটায় উদ্ভাসিত। পরক্ষণেই অন্ধকার। বড়সড় নিশ্বাস ফেলে মীনা বলে—কি যে কও দিদিমণি। ভাল গাই? হুঃ তাইলে এমুন পুড়াকপাল হয়? ভাতঠোকরানো কাকের দিকে একমুঠো ছাই ছুঁড়ে দিয়ে আপনমনে মীনা বকতে থাকে—আমার বুকখানের ভিতর বড় দুঃখ গো দিদিমণি। তাই মনের দুঃখে গাই। মনটারে শান্ত করি।

মীনার এহেন গানের পিছনে একটা পূর্ব ইতিহাস আছে। মীনার বাবা জীবন চৌধুরী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এক যাত্রাপার্টির নামকরা গাইয়ে ছিল। এক ডাকে গ্রামশহরের অনেক মানুষজনই তাকে চিনত। সুখে দুঃখে কিছুটা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে থাকতেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ জীবনের চোখে মায়াঞ্জন পরিয়ে দিয়েছিল। বাংলাদেশ জন্ম নেবার পর জীবন ভাবল—যাক বাঁচা গেল অনিশ্চয়তা কাটল বুঝি। নতুন আশায় বুক বেঁধে বাড়িসংলগ্ন জমিতে আরও

চারটে নারকোল আর ক'টা সুপারিগাছ লাগিয়েছিল জীবন। এমন কি পুবদিক ঘেষে একখানা ঘরও তুলে ফেলেছিল। মুজিবহত্যার পর হাওয়াবদল টের পেল জীবন। বছর কয় যেতে না যেতেই মোহভঙ্গ হল। মীনার জন্ম স্বাধীন বাংলাদেশে। ওর বড়বোন বীণা জন্মেছিল পূর্বপাকিস্তানে। বীণা বড়সড় হয়ে উঠেছে। ইজ্জৎ নিয়ে বুঝি আর থাকা চলে না। ছোট ছেলেদুটির ভবিষ্যৎও এদেশে অন্ধকার তাও বোঝা যাচ্ছে। তবু জন্মভিটে ছাড়া সহজ কথা নয়। তবে ফলন্ত আমগাছটা যেদিন কেটে ফেলল গুণ্ডারা, নালিশ করা গেল না—সেদিনই মনস্থির করে ফেলেছিল জীবন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে সে দেশের মাটি ছেড়ে ভারতের মাটিতে পা রাখল। কোলকাতার কাছেই রেললাইনের ধারে—জবরদখল কলোনীতে স্থান পাওয়া গেল। তবে এখানে না খেতে পেয়ে মরবার দশা। গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে ট্রেনের কামরায় কামরায় জীবন চৌধুরী গান ফিরি করতে শুরু করল। মীনার কথার বোল ফুটতে না ফুটতেই গানের গলা চিনতে পেরেছিল জীবন। জহুরী যেমন এক নজরে জহর চেনে। খুব যত্ন নিয়ে মেয়েকে গান শিখিয়েছিল সে। মীনাকে বলত—বুঝলা খুকি গানে সুর তাল আর উচ্চারণ যেনি ঠিক থাকে, না অইলে মার্ডার কেস। বাপের এসব উপদেশ আজও স্পষ্ট মনে পড়ে মীনার। বড় ভাল ছিল লোকটা। তবে গান ফিরি করবার জন্য ট্রেনের কামরায় মীনাকে ওঠানো যায় নি। বেঁকে বসেছিল সে। ততদিনে বিনা বেতনে সরকারি স্কুলে পড়তে শুরু করেছে মীনা। হোঁচট খেয়ে নয় দিব্যি টপ্‌কে টপ্‌কে ক্লাস এইটে উঠে পড়েছিল ও। সে সময় কলেজে পড়ুয়া মেয়েদের দূর থেকে তাকিয়ে দেখত মীনা। কাঁধে ব্যাগ নিয়ে ওই মেয়েদের মত তারও ইচ্ছে হত কলেজে যায়। মন লাগামছাড়া হয়ে উড়ত আকাশে। ক্লাসে প্রথম হওয়া মীনাকে মাস্টারেরাও উৎসাহ যুগিয়েছিল। এই ওড়ার স্বপ্ন দেখতে দেখতেই সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল। এতক্ষণ বাপের কথা ভাবতে ভাবতে চোখে জল এসে গিয়েছিল। অথচ সেই অভিশপ্ত বিয়ের কথা মনে পড়তেই মৃত বাপমাকে মাটির পৃথিবীতে নামিয়ে আনল মীনা। —শালার মাবাপের নিকুচি করি। দিব্যি পড়ত্যাছিলাম। ছাড়াইয়া দিল। সকলেই কইত মাইয়ার গলাখান খুব মিঠা—ঠিক যেনি বাপের মত। অগো এমন কি দরকার পড়ছিল ছুঁচ্যা মাইরা হাত গন্ধ করনের। সামাইন্য টাকার লাইগ্যা ভুষামাল নষ্টচরিত্র দ্যামড়ার লগে তরা বিয়া দিলি? অমন বাপমায়ের মুখে আগুন। পলাইয়া আইছি। বেশ করছি। —কার বাপের কি!

পুলিশ কনস্টেবল নরেন সাহাকে মনে পড়ল মীনার। লোকটাকে চিনতে পারা যায় নি। হাবভাব মোটেই পুলিশের মত ছিল না। বরঞ্চ কিছুটা নরম ধাতের বলেই মনে হয়েছিল। কেননা মীনার স্বপ্ন ভঙ্গের কাহিনী শুনে লোকটাকে চোখের জল

ফেলতে দেখেছিল মীনা। মাত্র বছর দেড়েকের মামলা। টুনি জন্মাবার পর লোকটা যেন ভূতের মত হাওয়া হয়ে গেল। সংসার গড়বার স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার। বাঁধ দিতে পারা গেল না। শরীরে আগুন ছড়ায়। মীনা নরেন সাহাকে গালাগাল দিতে থাকে। বাসনের ওপর রাগের ঝাল পড়ে। ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে রায়গিন্নীর ভুরু কুঁচকে ওঠে। নতুন কাজের মেয়েটির দিকে বিরক্তচোখে তাকান। কষে দাবড়ে দেবার ইচ্ছেটাকে সংযত করতে হল।

বাগানওয়ালা পেল্লায় বাড়িতে কাজের লোক পাওয়া খুবই দুষ্কর। আজ আছে কাল নেই। নিত্যদিনের সমস্যা। সমস্যা হবেই বা না কেন? বিরাট বাড়ি একান্নবর্তী পরিবার তো আজকাল গল্পকথা। ছোট পরিবার সুখী পরিবার। টোনা টুনি আর টুনটুনিকে নিয়ে সংসার। ছোট ছোট খুপড়ি ঘরের ফ্ল্যাটে শহর ছেয়ে গেছে। কাজের মেয়েরা কাজের সুখ বুঝে নিয়েছে। ঝামেলার বাড়িতে তারা থাকবে কেন? বেশ কিছুদিন বিপর্যয়ের পর একে পাওয়া গেছে। চটিয়ে কাজ নেই। নরমসুরে রায়গিন্নী বললেন—অত জোড়ে বাসন রাখিস না মা। কানে লাগে।

তোয়ালে দিয়ে ভেজা বাসন মুছতে মুছতে বলল মীনা—একখান আধ্যাত্মিক গান শোনবেন মাসিমা?

কাজের মেয়ের মুখে আধ্যাত্মিক শব্দটি কানে বাজে। তিনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই মীনা গান ধরে ফেলেছে—আমি কি ভুল করিলাম/গুরু না ভজিলাম/ মানুষের করিলাম কি ....

রায়গিন্নীর মুগ্ধ চোখ মীনার দিকে। নাতি নাতনিগুলো বাড়ি থাকলে ঝ্যাক্ ঝ্যাক শব্দে কী যে সব গান চালায়। গানের কী সব কথা। বিরক্তি ধরে যায়। টিভি বা রেডিওতে ভাল গান মাঝে মধ্যে হয় বটে তবে সুস্থির হয়ে যে শুনবেন সে সময় কোথায় তার। সংসারের হ্যাঁপা সামলাতে কখন ভোর থেকে রাত বারোটা বেজে যায় খেয়াল থাকে না।

এবাড়ির তিন ছেলে তাদের বৌরা সুলেখার ছোট মেয়ে রিনটিন সবকটা ডেলিপ্যাসেঞ্জার। নাতিদুটো এ বয়সেই ডেলিপ্যাসেঞ্জার। পড়ে খড়দহ রামকৃষ্ণ স্কুলে। নাতনিদুটো প্রায় মাইল চারেক দূরে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। বেলা দশটা বাজতে না বাজতেই বাড়ি ভোঁ ভোঁ। কবে থেকে এ বাড়ির দিনটা রাত্তির আর রাত্তিরটা দিন হয়েছে তা মনে করতে পারেন না সুলেখা। রাত্রে ভালমন্দ খাওয়ার সঙ্গে জমাটি আড্ডা চলে বহুক্ষণ। সকালে তো সব কোনরকমে নাকেমুখে গুজে ট্রেন ধরতে ছোটে সব। এই টুকরো টাকরার দিনে রায়পরিবার কী আশ্চর্যমন্ত্রে জোড়া লেগে আছে কে জানে। সুলেখার মনে এ কারণে আলাদা ধরনের তৃপ্তিবোধ। স্বামী সমর রায়ের মৃত্যুশোক এদের জন্যই বোধহয় ভুলে আছেন তিনি।

সন্ধ্যেবেলা বাগানবাড়িটা আশ্চর্য রহস্যময় হয়ে ওঠে। ঘন গাছপালা বলে গেট থেকে বাড়ি পর্যন্ত টিউবলাইট লাগানো হয়েছে ছেলেবৌদের শখে। দারুণ লাগে দেখতে। টুকটুক করে উড়ে যাওয়া পাখির দল ফিরতে থাকে। তখন হাসি গল্পে ভরে ওঠে রায়বাড়ি।

বাসনমাজা ঘরমোছার লোক না থাকায় বেশ ক'দিন ধরে একটানা টেনশন চলছিল। অনেকদিন পর সবাই টেনশন ফ্রি। তিন বৌ আর রিনটিন খেতে বসেছে। জমাচ্ছে মেজ বৌ বুলবুলি। আজ ট্রেনে সে হাতেনাতে মেয়েপকেটমারকে ধরা পড়তে দেখেছে। তার সরস বর্ণনা শেষহওয়া মাত্র ছোট রিমরিম কাজের মেয়ে নিয়ে পড়ল।

—আচ্ছা বড়দি মীনার ইন্টারভিউ তো তুমিই নিয়েছিলে। এমন একখান চৌকশ মেয়ে কিভাবে ধরলে বলত?

বাটিতে বাটিতে মাছ তুলছিল শর্মিলা। হেসে বলল—কী যে বলিস! ধরলাম কোথায়? ওই তো ধরা দিল।

মেয়েটি নাকি ক'মিনিটের মধ্যে গোটা দশ নারকোল ঝুড়ে দিয়েছে। মা বলছিলেন—বলল বুলবুলি।

ডাল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে রিমরিম বলল—দোতলার কার্নিশে নেমে অতবড় বটচারাটা কিভাবে কাটল মীনা না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

রান্নাঘর ক'দিনেই ঝক্‌ঝক্ করছে, বলল বুলবুলি। শর্মিলা মুখের গ্রাস গিলে নিয়ে বলে—আরে বাপু খুঁতো মেয়ে বলেই ধরা দিয়েছে।

খেতে খেতে শর্মিলা মীনার জীবনচরিত শোনায় ওদের। মেয়েটার দু'দুটো বিয়ে। দুই স্বামীর দুই বাচ্চা। এখন আবার কাকে নিয়ে যেন থাকে। বদচরিত্রের মেয়ে বলে মিত্র আর ঘোষবাড়ি থেকে কাজ ছুটে গেছে।

শর্মিলার কথা শেষ হবামাত্র হাজার পাওয়ারের আড্ডার বাল্ব হঠাৎ ফিউজ হয়ে যায়। ছোট আর মেজর রসেভরা মুখদুটো চুপ্‌সে গেছে। এবাড়ির সবাই জানে রিমরিম তার মনের কথা চেপে রাখতে পারে না। খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে সে হঠাৎ বলে ওঠে—ওরে বাবা এড্‌স ফেড্‌সের ব্যাপার হলে সর্বনাশ।

বুলবুলি ভাত মাখছে কিন্তু খাচ্ছে না। থালাবাটি মীনার মাজা ভাবতেই গা গুলিয়ে উঠছে। উচ্চগ্রামে সে বলে, তাই অত সাজগোজের বাহার। বাসনমাজা ঝি'এর এত ঝক্‌মকানি বাবার জন্মে দেখি নি।

রিনটিন খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল—তখন থেকে তোমরা কি পাগলের মত বক্‌বক্ করছ বলত? মেয়েটি লেখাপড়া জানে। সেদিন আনন্দবাজার পড়ছিল। খারাপ হবার ইচ্ছে থাকলে ওর যা গানের গলা এতদিনে গয়নাগাটি পরে পায়ের

ওপর পা তুলে খেতে পারত। বাড়ি বাড়ি বাসন মেজে বেড়াত না। রিনটিনের কথায় যে ওরা পাত্তা দেয় নি তা বোঝা গিয়েছিল খাবার টেবিলের আড্ডায়। কারণ এরপর বেশ কিছুদিন যাবৎ মীনাচর্চা খাবার টেবিল দখল করে নিয়েছিল। বাজে বদচরিত্র কাজের মেয়ের জন্য কত বিপদ আপদ চুরিচামারি কত সর্বনাশ হতে পারে উদাহরণসহ জল্পনা কল্পনা বেশ ভালই চলছিল।

কিছুদিন পর রিনটিনের খেয়ালে এল মীনাচর্চা সম্পূর্ণ বন্ধ। দেশের ঘটনাবহুল রাজনীতি, ছেলেমেয়ের পড়াশোনা, আচম্‌কা দুর্ঘটনা, শাড়ির রঙ কোয়ালিটি ইত্যাদি বিষয়বস্তু দ্বারা আড্ডা অলঙ্কৃত হচ্ছে। সকলের সব ভয়, আশঙ্কা, দুর্ভাবনা তুচ্ছ করে মীনার আসন যেন সবার ইচ্ছেতেই পাকা হয়ে গেল। হবেই বা না কেন? বাসনের ডাই, ওপরনিচ মিলিয়ে খান আষ্টেক ঘরের মোছামুছি, বালতি বালতি কাপড়কাচা প্রায় রোবটের ক্ষিপ্রতা নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকের বাড়তি কাজ হাসিমুখে করে দিচ্ছে। এজন্য বকশিস হিসেবে বেশ ভাল টাকা পাচ্ছে। বাড়তি আয়ের পাওনা টাকায় ক্রীম পাউডার সিন্দুরের খরচা উঠে আসে।

মাঝে মধ্যে কাজে আসতে দেরী হয়ে যায় মীনার। সেও ডেলিপ্যাসেঞ্জার। দুটো স্টেশন পেরিয়ে আসতে হয় তাকে। ভোরবেলা নানা কাজ থাকে। ছেলেমেয়েদুটোর বইপত্তর গোছানো, টিফিনবাক্সে বাসি রুটি ভরে দেওয়া—এছাড়া আছে নিজের সাজগোজ। এসব করতে গিয়ে কখনো সখনো ট্রেন ফেল হয়ে যায়। সকালে দেরী হওয়ার মানে সারাদিন তার রেশ টানতে হয়। মন মেজাজ খিঁচড়ে যায় সেদিন। আজ মীনার দেরী হয়েছে। ট্রেনটা একটুর জন্য মিস্ হয়েছে। দেরী হওয়া সত্ত্বেও রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে অদ্ভুত হাল্কা লাগছে নিজেকে। সাজটা আজ দারুণ হয়েছে। পরনের গোলাপি শাড়ির সঙ্গে সব কিছু ম্যাচ করা। হাতে গোপালি চুড়ি, কানে গোলাপি টাব। কাঁধে ঝুলছে রিনটিন দিদিমণির দেওয়া কালো রঙের ভ্যানিটি ব্যাগ। পায়ে রিমরিম বৌদির বাতিল হওয়া হিলতোলা জুতো। ট্রেনে অনেকেই ফিরে ফিরে ওকে দেখেছে। একজন রীতিমত ভদ্রলোক মীনাকে বলেছে—এই যে দিদি একটু সরে দাঁড়ান না।

চমৎকার মন ভাল করা স্বপ্ন মীনার পেছু পেছু ধাওয়া করে। হেঁটে নয় উড়ে চলেছে মীনা। গলায় গুন্‌গুন্ গান। যেন কানের কাছে কেউ অনবরত বলে চলেছে—তুমি বাসনমাজা ঝি মীনা নও—অন্য কেউ অন্য কেউ।

রোজকার মত সিঁড়ির তলায় পরে আসা ভাল শাড়ি ছেড়ে নিল মীনা। ব্যাগে রাখা 'বাসনমাজা স্পেশাল' সাধারণ শাড়ি পরে নিল। হাতের গোলাপি চুড়িগুলো খুলে রাখে—না হলে সাবানজলে ওগুলোর রঙ ঝাপ্‌সা হয়ে যাবে। বুকের ভেতর সুখের কাঁপুনি। চুলগুলো হাতের মুঠোয় নিয়ে খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে নিজেই

নিজেকে শুনিয়ে বলতে থাকে-—থোড়াই আমারে বাসনমাজা ঝি মনে হয়? তাইলে এ সে রাস্তাঘাটে দিদি বৌদি কইয়া হাঁক দিত নাকি? অভ্যেসমত আরও পাঁচসাতকথা বলতে বলতে ফুলঝাড়ু হাতে ঘরে ঢোকে মীনা। দেখল টেবিলের ওপর খোলা বই। পড়ছে দিদিমণি। আজ বোধহয় ছুটি। মীনা দাঁড়ায় টেবিল ঘেষে। বই-এর পাতায় ওর চোখ। কালো কালো পিঁপড়ের সারির মত ইংরেজী অক্ষরগুলো ওর চেনা। অমনি বুকের ভেতর শব্দ। বই এর পাতায় মীনার চোখ দেখে রিনটিন ঠাট্টাচ্ছলে বলে উঠেছে—কি গো ইংরেজী পড়তে পার?

মীনার চোখ হাসে। লজ্জিত মুখ। সে বলে তোমাদের মত জানি নাকি? তয় কিছু জানি। ইউ আর এ গুডলুকিং গারল, আই অ্যাম গোয়িং টু স্কুল, দি বার্ডস আর ফ্লাইং ইন দি স্কাই .... যেন খুব মজার খেলা এভাবেই সে বলে, কি গো দিদিমণি স্যানটেন্সগুলান ঠিক হইছে? মীনা যেন একটা আবিষ্কার এভাবেই ওর দিকে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে আছে রিনটিন।

—কোন ক্লাস অব্দি পড়েছ?

—কেলাস এইট।

—লেখাপড়া ছেড়ে দিলে কেন?

—হায়রে আমার কপাল! লেখাপড়া শেখার এত ইচ্ছা ছিল এ জেবনে আর কিছুই হইল না। সংসার করুম সুখে তাও হইল না। কে জানত লোকের বাড়ি বাড়ি বাসন মাইজ্যা প্যাট ভরাইতে হইব।

মীনার দীর্ঘশ্বাস শুনতে শুনতে আরও কিছু আবিষ্কারের আশায় রিনটিন বলে—চিঠি লিখতে পার?

—ক্যান পারুম না?

—লেখ দেখি।

মীনা ওর হাতে ধরা ফুলঝাড়ু রেখে দেয় একপাশে। সারা মুখে বিজবিজে ঘাম। কোমরে জড়ানো আঁচল খুলে নিয়ে মুখ মোছে। তারপর হাত বাড়িয়ে বলে—দাও দেখি একখান কাগজ আর পেন। উবু হয়ে বসে নিজের দিদিকে সম্বোধন করে একটা গোটা চিঠি লিখে ফেলল মীনা। মুক্তোর মত হস্তাক্ষর। শুরু করেছে—শ্রীচরণেষু দিদি শতকোটি প্রণাম পূর্বক নিবেদন এই যে .... পুরো চিঠিতে দুচারটে 'চ' এবং 'ছ' এর আবোলতাবোল ভুল ছাড়া আর কোন ভুল নেই।

রিনটিন ওর লেখা চিঠি ভাঁজ করে বই-এর ভেতর গুঁজে রাখে। তারপর বলে—তোমায় পড়বার জন্য ক'টা বই দেব। গান আর লেখাপড়া চালিয়ে যাও। তার মত মূর্খ মেয়ের চিঠি কেন যে দিদিমণি রেখে দিল ভাবতে ভাবতে তড়িৎগতিতে ঝাড়ু চালাতে থাকে মীনা। দিদিমণির বোকামির কথা ভেবে হাসি

পায়। বড়লোকের মাইয়া তুমি কি বোঝবা? পড়তে কও গান করতে কও ভাল কথা। তা সারাদিন খাটনির পর ঘরে ফির‍্যা রাঁধনবাড়ন আছে না? পোলাপান খাইব কি? রাতে নন্দু আইব—তার হ্যাঁপা সামলান—সেও তো কাজ।

নন্দুকে নিয়ে আজ বছর তিনেক ধস্তাধস্তি চলছে। বিয়েতে রাজী করানো যাচ্ছে না। নন্দুর বাবার মুদীর দোকান। ওদের চার পাঁচঘরের বাড়ি বারাসত রোডে। মীনাকে বিয়ে করলে সে বাপের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে এই বাহানা দেয়। অ্যাদ্দিন পর্য্যন্ত নন্দু অবশ্য তার প্রেমে কোন ঘাটতি দেখায় নি। লোকটা আপদে বিপদে পাশে দাঁড়িয়েছে। ছেলেমেয়েকে বইখাতার যোগান সেই দেয়। ধরতে গেলে নিজের বাপের মত আগলে রাখে ওদের। নন্দু মীনাকে বোঝায়—তোর আর বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে বিয়ের পিঁড়েতে বসতে পাচ্চি নে। দোকানে বসি বলেই না তোকে টাকাপয়সা দিতে পারচি। আগেই তো বলেচি বিয়ের কতা বাবার কানে গেলে ফাঁকা হয়ে যাব। নিজে বুজচিস্ না? টাকা ছাড়া এক পা চলা যায়?

সব বুঝলেও স্বস্তি নেই। এ সিন্দুরের চিহ্ন নকল বই কিছু নয়। ঘর মুছতে মুছতে বেশী মাত্রায় সোচ্চার হয় মীনা।

—টাকা পয়সা বুঝি না। তরে দিয়া যদি রেজিস্ট্রি না করাই তো আমি বাপের বিটি না। খাবার ঘরে যেতে যেতে রিনটিন মীনার গান শুনতে পায়।

—আমি তরীর আশায় ঘর ছাড়িলাম গো/কুলের মুখে কালি দিলাম ....

দেখতে দেখতে বছর ঘোরে। বারোটা মাস যেন চোখের পলক। মীনা একদিন রায়বাড়িতে ঢুকে দেখতে পেল সামনে ভাড়াবাঁধা মিস্ত্রীরা রঙ বোলাচ্ছে। ক'দিন ধরেই এ বাড়িতে একটা ব্যস্তসমস্ত ভাব লক্ষ করা গেছে। কী ভেবে মীনার বুকের ভেতর দোলানি লাগে। নিজেকে চেপে রাখা যায় না। একদৌড়ে মীনা বুলবুলির সামনাসামনি। হাতে ব্যাগ দুলিয়ে অফিসে যাবে বলে চটিতে পা ঢোকাচ্ছে। মীনা বলল—মেজবৌদি দিদিমণির বিয়া? চোখ নাচায় বুলবুলি—তুই কি করে জানলি? নিশ্বাস আটকে যায়। হৃৎপিন্ডের ধড়াস ধড়াস শব্দ ও নিজেই শুনতে পাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম বেদনাবোধ শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছে রায়বাড়িতে যখন তখন আর দিদিমণির দেখা পাওয়া যাবে না। এ বাড়ি যে রূপকথার রাজবাড়ি মীনা তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। আর এই রাজবাড়ির রাজকন্যে যে রিনটিন দিদিমনি তাও সে জানে। যেমনি সুন্দর দেখতে তেমনি মিঠা স্বভাব। কত মোটা মোটা বই পড়ে দিদিমনি অথচ একটুও অহঙ্কার নাই। তার মত পোড়া কপাইল্যা মেয়েরেও কত সম্মান দেয়। দরকারে ছুটি নিতে হলে নন্দুকে বলে মীনা, রায়বাড়িতে কামাই করুম না। অগো বাড়িতে না গেলে কেমন যেনি আলুনি আলুনি ঠেকে।

—কেন তোর কি নেশা ধরেচে? বলে নন্দু।

তা একরকম নেশা বই কি? আসলে মীনা তার গোপন কথাটি কাউকে বলে নি। এমন কি নন্দুকেও নয়। রায় বাড়ি থেকে কিছু কিছু স্বপ্নদৃশ্য চয়ন করে বুকের ডালায় তুলে রাখে সে। সেসব স্বপ্ন শুকিয়ে যায় না। বাসি হয় না। শুধু কখনো সখনো সৌরভ বিলোয়। মনটাকে নিয়ে যায় দূরে অনেক দূরে। মীনা বুদ হয়ে যায়। ভাবে আর ভাবে। এ বাড়ির সবাই রহস্যময় স্বপ্নজগতের বাসিন্দা। জেনেছে সে ছুটবৌদি এঞ্জিনীয়ার। চোখে তার সানগ্লাস কেমন গটগটিয়ে হাঁটে। মেজবৌদি যেনি মেম। ছুট ছুট চুল। গালে কি রঙ মাখে? না গালের লালচে ভাবটাই তার আসল রঙ, জানে না মীনা। স্বামীর সঙ্গে সে যখন ফরফরিয়ে ইংরেজী বলে মীনার ঘর মোছার গতি আপনা থেকেই ধীর হয়ে আসে। বড় বৌদির চেহারাখান যেনি লক্ষ্মীঠাকুর। ছুটির দিন সকলেরে কেমুন ডাইক্যা ডাইক্যা খাইতে দেয় দেইখাও সুখ।

মনে পড়ে যায় মীনার একদিন সে একজনের দিকে চারজোড়া চোখের ভালবাসা উপচে পড়তে দেখেছিল। ছুটির দিন সকালবেলা। মেয়ে বৌরা জলখাবার খেতে বসেছে। রিনটিন দু'পিস্ পাউরুটি একটা ডিমসেদ্ধ নিয়ে কলা মিষ্টির প্লেট সরিয়ে রেখেছে। খাও খাও বলে তিন বৌ-এর কী সাধাসাধি। শেষে শর্মিলা উঠে গিয়ে সুলেখাকে ডেকে এনেছে। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সুলেখা বলছিলেন—খেয়ে নে মা। দিনের পর দিন কী চেহারা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস না?

স্বপ্নদৃশ্য তুলে নিতে নিতে মীনার মনে হয়েছিল নিজের ছেলেমেয়েকে কি সে এত আদরযত্ন কোনদিন করেছে? নিজের তো কথাই নেই। শরীরের আদর ছাড়া অন্য আদরের স্বাদ কি সে জানে? আউলবাউল মনটাকে শান্ত করতে গিয়ে হেরে গিয়েছিল মীনা। ঘরমোছার জলের সঙ্গে চোখের জল মিলেমিশে একাকার।

নন্দু এল একটু রাত করে। এসেই খিদের জ্বালায় খেতে বসেছে। মীনার টালিছাওয়া ভাড়া করা ঘরটিতে চল্লিশ পাওয়ারের বাল্ব। এখন লোডশেডিং চলছে। লম্ফের আলো জ্বলছে টিম্‌টিম্। আধো অন্ধকারে মীনার সাদা দাঁতের হাসি দেখতে পাচ্ছে নন্দু। সামান্য উত্তেজিত। নন্দুর পাতে লটে মাছের চচ্চড়ি দিতে দিতে মীনা বলল, শুনছ? দিদিমনির বিয়া ঠিক হইছে। তা ধর গিয়া দিন দশের জন্য নিশ্চিন্দি। মাসিমা কইয়া দিছে বাচ্চাগো নিয়া আসিস মীনা। এখানেই খাওনদাওন করব।

ভাল। সে ক'দিন তোর হাতের রান্না খাওয়া হবে না।

মীনা নন্দুর কথায় কান দেয় না। সে বলে ছুটবৌদি আমার জন্য দারুন একখান শাড়ি কিনছে। শাড়ির রঙে রঙ মিলাইয়া আমারে ফল্‌স হার দুল কিন্যা দিবা কিন্তু।

—চচ্চড়িটা বেড়ে রেঁধেচিস মাইরি। মাখা ভাত তৃপ্তির সঙ্গে চিবুতে চিবুতে বলে নন্দু—তোর রায়বাড়ির বৌদি তোকে গয়নার সেট্ কিনে দেবে দেখে নিস।

নন্দুর ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গিয়েছিল। শাড়ির রঙের সঙ্গে ম্যাচ করে ফল্স গয়না কিনে দিয়েছিল রিমরিম।

দিনেকয়েকের ভেতর রায়বাড়ির চেহারা পাল্টে যেতে দেখেছিল মীনা। রূপকথার রাজবাড়ি যেন বই এর পাতা থেকে উঠে এসেছে। সানাই এর সুর, আলোর রোশনাই, ফুলের ছড়াছড়ি, খাওয়াদাওয়ার অপর্যাপ্ত ব্যবস্থায় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে মীনার। খাটতে খাটতে মুখে ফেনা উঠলে কি হবে বেশ ক'দিন ধরে ও আকাশের গায়ে পুষ্পক রথের যাওয়া আসা দেখতে পাচ্ছে। ঝল্মলে সাজে সজ্জিতা রথের সওয়ারীদের মীনা চেনে। এ বাড়ির মেয়ে বৌদের সুখী সুখী মুখ। দেখে মীনার দুঃখ হচ্ছে না। কারণ সুন্দর দৃশ্য দেখাও যে এক ধরনের সুখ তা জানে মীনা। তাই হয়ত কাজের মাঝে গান ওর সঙ্গ ছড়ে না।

ঘোরে ঘোরে কবে যে উৎসবের দিন পেরিয়ে যায় ঠিক বোঝা যায় না। রিনটিন এখন তার শ্বশুরবাড়িতে। উৎসব শেষ হলেও তার রেশ এখন রয়ে গেছে। এখনও বেশ কিছু আত্মীয় রয়ে গেছে। অষ্টমঙ্গলার পর বাড়ি ফাঁকা হবে বলে মনে হয়েছে মীনার।

উঠোনের তারে কাপড় মেলতে মেলতে মীনা দেখল ব্যাগভর্তি কি সব বাজার নিয়ে রিমরিম বৌদি খুব ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বাড়ি ঢুকছে। মীনাকে দেখে থমকাল—কাল একটু সকাল সকাল আসিস মীনা। তোর দিদিমণি আর তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন আসবে।

এতদিন মীনা অন্য কাজের বাড়ি বুড়ি ছুঁয়ে আসছিল। আজ পুরোপুরি ডুব দিল। সেজেছে খুব। বিয়েতে পাওয়া রোলেক্সের টান দেওয়া কমলা রঙের শাড়ি পরেছে। সঙ্গে সেটের গয়না পরতে ভোলে নি। দিদিমনির শ্বশুরবাড়ির লোকদের সামনে বাসন মাজা ঝি-এর পরিচয় কিছুতেই প্রকাশ করা চলবে না। একফাঁকে মেজবৌদির ড্রেসিংটেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে নিল মীনা। না—তার চেহারায় বাসনমাজা কাপড়কাচা মেয়ের কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

গেটের সামনে অ্যামবাসাডার গাড়িটা থামতেই নেতিয়ে পড়া বিয়েবাড়ি সজাগ হয়ে ওঠে। মীনা দেখছে শাঁখের আওয়াজ আর হুলুধ্বনির ভেতর জমকালো ঢাকাই বেনারসী পরে রিনটিন জামাইবাবুর সঙ্গে গাড়ি থেকে নামল। তাদের সঙ্গে আর একটি সুন্দরী অচেনা মহিলাকে নামতে দেখে মীনার চোখ আটকে যায়। মেয়েটির মুখে যেন আলো মাখানো। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। ছোট বৌদির নির্দেশমত জলখাবারের তদারকিতে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল মীনা।

মেয়েদের আড্ডা বসেছে ওপরের হলঘরে। সেখান থেকে তাদের উচ্চকিত খিল্খিল্ হাসির শব্দ কিচেনে পৌছে যাচ্ছে। ট্রেতে জলখাবারের প্লেট সাজাবার

পর চট্ করে বাথরুমের আয়নাতে নিজেকে একবার দেখে এল মীনা। যেন সে এ বাড়িরই মেয়ে কিংবা আত্মীয়া এই ভঙ্গী এবং ভাবনা নিয়ে মীনা ট্রে হাতে ঘরে ঢোকে। প্লেট এগিয়ে দিতে দিতে খুব মনযোগ সহকারে ওদের আলাপচারিতা শুনতে থাকে। রিমরিম বলছে—রিনটিন তোমার ননদিনীটি যে টি ভি সিরিয়ালে অভিনয় করে এখবরটি তো জানা ছিল না।

বুলবুলি বলল—তাই তখন থেকে কোথায় তোমাকে দেখেছি দেখেছি বলে মনে হচ্ছে অথচ রিনটিনের বিয়ে বৌভাত কোন অনুষ্ঠানেই তো তুমি ছিলেনা। শুভশ্রী সলজ্জ কণ্ঠে বলছে, কি করব? সেসময় কোলকাতার বাইরে শুটিং পড়েছিল—কিছুতেই আসা গেল না।

রিনটিন সহাস্যমুখে ননদের দিকে তাকায় এবং বলে অভিনয় ওর পেশা কিন্তু নেশা হচ্ছে সমাজসেবা। এর মধ্যে ও অনেক কিছু ....

আরক্তমুখ শুভশ্রী বাধা দেওয়াতে রিনটিন থেমে যায়। চোখের সামনে টিভি আর্টিস্ট। মীনার দু'চোখে বিস্ময়। ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে মীনা স্বপ্নদৃশ্য চয়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শরীরমনে ঘোর লাগা মীনা আচমকা চম্‌কে ওঠে। সবার স্তম্ভিত দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে শুভশ্রী উঠে এসে মীনার হাত ধরেছে। মীনা শুনতে পাচ্ছে শুভশ্রীর মিষ্টি গলা, দিদি তুমিও এস। আমাদের সঙ্গে লুচি মিষ্টি খাও। না সুখে নয় একধরনের লজ্জায় কুঁকড়ে যায় মীনা। এই মুহূর্তে বাসনমাজা ঝি'-এর পরিচয় জানাতে বিন্দুমাত্র লজ্জা হয় না তার। জড়ানো গলায় সে বলে যায়—কী যে কও দিদিমনি। আমি এ বাড়ির বাসনমাজা ঝি আমারে ....

—জানি তো। মীনাকে থামিয়ে দিয়েছে শুভশ্রী। তার কুন্দশুভ্র দাঁত ঝল্‌সে ওঠে।

—তাইলে? মীনার আশ্চর্য হওয়া কণ্ঠস্বর। শুভশ্রীর শান্ত গলা। সে বলে—তাহলে কি? আমি বৌদির কাছে সব শুনেছি। খুব সুন্দর গান গাও তুমি। লেখাপড়া জান। বাসনমেজে বাচ্চাদের মানুষ করছ। সৎভাবে বেঁচে থাকার লড়াই চালাচ্ছ। শুভশ্রী নিজের জন্য নির্দিষ্ট প্লেট মীনার হাতে ধরিয়ে দেয়। রিনটিনের দিকে অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলে—বৌদি তুমি আর আমি এক প্লেটে কেমন?

কিছুক্ষণ পরের কথা। চা আর জলখাবারের একগাদা বাসন ধুতে ধুতে মীনা আকাশের গায়ে আজ আবার পুষ্পক রথের যাওয়া দেখতে পাচ্ছে। আর কী আশ্চর্য এবারের রথে মীনা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে নিজেকে। দিব্যি হাসি হাসি মুখে সাজনগোজন চেহারায় সওয়ারী হয়ে বসে আছে রথে। বুকের ভেতর খুশীর জোয়ার। আনন্দে আঁকুপাঁকু মীনা সামান্য সোচ্চার গলায় গান ধরেছে—আকাশের অস্তরাগে তোমারি স্বপ্ন জাগে/তাইতো হৃদয়ে দোলা লাগে দোলা লাগে ....

—

এক যে ছিল রাজপুত্র

অবন্তিকা স্বাভাবিক থাকতে চাইল। অন্যান্য দিনের মতই। নির্ভাবনায় কলেজ যাওয়া আসা—সঙ্গী রমরমা উত্তেজনা—তবে চাপা অবস্থায় রসিয়ে উপভোগের মধ্যে দিয়ে। হল না। বারবার অন্যমনস্কতা। 'মন' নামক অধরা বস্তুটা এখন লাগামছাড়া। ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে স্বাপ্নিক কল্পলোকে। ক'দিন আগেও সে কি ভাবতে পেরেছিল এমন জব্দে পড়তে হবে তাকে।

অদিতির এখন ম্যাথের ক্লাস চলছে। সে অবন্তিকার একমাত্র ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। অবন্তিকার ক্লাস নেই। কে জানে কেন কমনরুমে একগাদা ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ওর বসতে ইচ্ছে করছিল না! তাই ও এসে বসেছে কলেজের পেছন দিকের মাঠে আশ্চর্য সুন্দর গাঢ় সবুজবর্ণ ঝাঁকড়া গাছটির নিচে। একা। ফাঁকা মাঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে কিছু ছাত্রছাত্রী। অভ্যেসবশে অবন্তিকা ব্যাগ থেকে বই বার করেছে। সেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ। পড়বে কি? কালো কালো অক্ষরগুলি যেন থেমে যাওয়া পিঁপড়ের সারি। বই এর পাতায় মনোনিবেশকারিনীর অভিনয় এমন উচ্চপর্যায়ের যে সুশান্ত ওর অভিনয় ধরতে পারল না। তাই সে সামনে দাঁড়িয়ে বলল—বই পড়ায় দারুন মন দেখছি। একা একা কেন? অদিতি কই?

চম্‌কে উঠল অবন্তিকা। কেউ যেন ঢিল ছুঁড়ে ভেঙ্গে দিল কল্পনার সাতরঙা রামধনু। ঘোর কেটে গেল। দেখল সুশান্তকে। হাসছে। ছেলেটার মাথায় একরাশ এলোমেলো চুল। চোখে সামান্য ভারী চশমা। বড় বড় ভাবালু চোখদুটো কৌতুকোজ্জ্বল। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ। সে ফার্স্টক্লাস পাবে বলে স্যারেদের ধারনা, জানে অবন্তিকা। ওকে নিয়ে কবিতা লিখে খাতা ভর্তি করার কারণে ছাত্রছাত্রীমহলে সুশান্তর কবি উপাধিপ্রাপ্তির ঘটনাটিও জানে সে। হয়ত তাই ওকে দেখামাত্রই তার রক্ত চলাচল দ্রুত হয়ে ওঠে। প্রায় বছর দুই হতে চলল কলেজে। এখনও ছেলেদের সামনে স্বচ্ছন্দ হতে পারে নি। ওদের দেখলেই কেমন যেন গুটিয়ে ফেলে নিজেকে। কখনো সখনো অদিতির ঠাট্টা শুনতে হয়—এবার একটা পাহারাদার যোগড় করে ফেল। কদিন ধরে আর ঠেকা দেব?

নির্জন তপস্যায় ব্যাঘাত ঘটলেও ওর দিকে তাকিয়ে ভদ্র হাসি হাসল সে। নিজের হাসিকে অমনি সোচ্চার করে সুশান্ত বলল—পাশে বসতে পারি? না তাড়িয়ে দেবে?

বই এর দিকে চোখ রেখেও সুশান্তকে বার দুই দেখে নিল অবন্তিকা। কিছুটা স্মার্ট হবার চেষ্টা চালিয়ে তরল গলায় বলে উঠল—বসতে পারেন। তবে কেউ যদি আমাকে দেখে সুশান্ত সুশান্ত বলে চেঁচাতে থাকে সে দায়িত্ব আপনার।

—কেন চেঁচাক না। আমাকে দেখে কেউ যদি অবন্তিকা অবন্তিকা বলে চেঁচায় আমি গাঁটখরচা করে তাকে মিষ্টি খাইয়ে দেব।

সুশান্তর ওপর ঠিক রাগ করা যায় না। বরং ওর হাবভাব চালচলন দেখলে হাসি পায় অবন্তিকার। বিংশ শতাব্দীর শেষ। চাঁদ মঙ্গলগ্রহে জয়যাত্রা। এসময় কবিতার মাধ্যমে কেউ প্রেমালাপ চালায়? অবন্তিকার মনে হল ছেলেটি না আবার এখন কবিতা লেখা খাতাটির কথা তোলে। ওঃ অসহ্য এই ন্যাকাপনা। লেখালেখির ব্যাপরাটা সে প্রথম অদিতির কাছে শুনেছিল। বলেছিল ও—মন্দ লেখে না রে। হেসে হেসে অদিতি 'দূরের তুমি' থেকে এক পঙ্‌ক্তি শুনিয়েছিল তাকে—

—সাগরসম অতলগভীর দৃষ্টি তোমার চোখে,
মেঘের মত চুল উড়িয়ে যাও তুমি কোন দেশে?
হাওয়ায় তোমার পরশ যে পাই গোলাপ গন্ধঢালা,
যুঁই মালতীর শুভ্র শুচি তোমার হাসিমাখা....

গাছের পাতার ফাঁক গলে ঝিরঝিরে রোদ গায়ে মেখে অবন্তিকা চুপ করে বসেছিল। আসলে স্মার্ট হতে গিয়ে ফের নার্ভাসনেসে কাবু। সুশান্ত অপলকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। কিছুটা যেন অপ্রস্তুত। সামলে নিল। অপ্রস্তুতের ভঙ্গী ঝেড়ে ফেলে বলল—বাপরে বাপ! দারুন ঘাবড়ে গেছ তুমি। নাঃ তোমার পাশে বসা যাবে না। তবে একান্ত অনুরোধ যদি....

বই বন্ধ করে ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল অবন্তিকা—সুশান্তদা ঘন্টা বেজে গেছে। ওই যে অদিতি আসছে। জি এমের আবার খুব রাগ। দেরী করে ক্লাসে ঢুকলে বকুনি খেতে হবে।

তীক্ষ্ণ রোদ্দুরের ভেতর অবন্তিকার এগিয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে রজনীগন্ধার সৌরভের স্পর্শ পেল সুশান্ত। পেছন থেকে অবন্তিকার কানে এসেছিল ওর হতাশাব্যঞ্জক মন্তব্য—বাব্বাঃ মেয়েটা দুর্দান্ত পাশ কাটাতে পারে। কতজন পড়ল। শুধু যাকে নিয়ে লেখা....

ক্লাস করতে করতে অবন্তিকার মনে হল সুশান্তর সব ভালো কিন্তু ছেলেটি একটুও ম্যাচিওরড্ নয়। জি এম কি লেকচার দিচ্ছেন কিছুই শুনতে পাচ্ছে না সে। একসময় সুশান্তও কখন যেন অস্পষ্ট হতে হতে বিলীন হয়ে গেল। অবন্তিকা এক আশ্চর্য রোমাঞ্চকর স্বপ্নের মধ্যে ডুবে গেল। মাত্র একদিন আগে এক জ্যান্ত রাজপুত্রের সঙ্গে দেখা হয়েছে তার। কোন মন্ত্রবলে সে যে তাকে দখল করে নিয়েছে বোঝাই যাচ্ছে না। অবশ্য ও জানে রাজপুত্রের স্বপ্ন সে চাইলেই দেখতে

পারে। কারণ আছে বৈ কি! কৈশোর উত্তীর্ণ হতে না হতেই—বাঃ কী সুন্দর দেখতে! দারুন! এ মেয়েকে সাবধানে রাখা দরকার—আত্মীয় স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীর এধরনের মন্তব্যে রূপের অহঙ্কার তার মধ্যে স্থায়ী হয়েছে, সে সম্পর্কে সচেতন অবন্তিকা। সত্যিকথা বলতে কি কলেজে ঢুকতে না ঢুকতেই বিভিন্ন ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে ওর অহঙ্কার ক্রমশঃই দানা বেঁধেছে। হাতে এসেছে গোটা দশ বারো প্রেমপত্র। প্রত্যেকটি সে রিজেক্ট করেছে। কিন্তু যত্নসহকারে গোপন জায়গায় তুলে রেখেছে। অবন্তিকা ইতিহাসের যুবক অধ্যাপক এন এন ঘোষের ওর দিকে স্থিরদৃষ্টি বেশ কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছিল। একদিন অদিতি ওর পাশে অথচ ঘোষ স্যার ওকে উদ্দেশ্য করে বললেন—নজরুলের অগ্নিবীণা বইটি কি আছে তোমার কাছে? আজকাল যা সব এচোঁড়ে পাকা ছেলেমেয়ে। পরদিন করিডোর দিয়ে ঘোষ স্যারের যাতায়াত কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। চারদিক থেকে ছেলেমেয়েরা চেঁচাচ্ছে 'অগ্নিবীণা' 'অগ্নিবীণা'।

আতঙ্ক প্লাস মজা প্লাস উত্তেজনা—সব মিলিয়ে দিনগুলো মন্দ কাটছিল না। কিন্তু কেন যেন গতকালের কয়েকঘন্টার অস্তিত্ব বুক জুড়ে চেপে বসে আছে। রোজকার গতানুগতিক ছকটাকে হঠাৎ পাল্টে দিয়েছে। অন্য সব উত্তেজনা এখন ফ্যাকাসে ম্রিয়মান।

অবন্তিকা গতকাল অদিতির বাড়ি গিয়েছিল। প্রাচী সিনেমাহলের গায়ে এক গলির ভেতর পুরোন আমলের দোতলা বাড়ি। সামনে চা আলুর চপ। দুবন্ধুতে মিলে ভালমত আড্ডা চলছিল। এমন সময়ে—এখানে আড্ডা জমিয়েছিস? আমি বাদ! একতলায় এক্ষুনি খুঁজে এলাম তোকে।

অবন্তিকার মুখে আলুর চপাংশ। চিবোন বন্ধ। সে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল অচেনা আগন্তুকের দিকে। মন জুড়ে একটা বিশেষণ ঠেলে উঠছিল—দুর্দান্ত! যুবকের লম্বা ফর্সা টানটান অভিজাত চেহারা। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। সে রোমান্টিক অথচ পুরুষালী।

স্তম্ভিত অবন্তিকাকে দেখে যুবকটি অদিতিকে জিজ্ঞেস করেছিল—বন্ধু?

অদিতি হ্যাঁ অর্থক মাথা দুলিয়ে বলেছিল—কেমন?

—দারুন! তারপর—সত্যিকথা বললাম বলে কিছু মনে করো না। তুমি বললাম বলেও—অনেক ছোট তুমি—বলেছিল সেই যুবক।

অদিতি তখন গড়গড়িয়ে বলে চলেছে—মাসতুতো দাদা। আই আই টির প্রাক্তন ছাত্র। বর্তমানে হিন্দুস্থান লিভারে আছে। থাকে বম্বেতে। নাম অরুণোদয় বোস।

পরিচয়াদির পর অদিতির অরুদা জোর করে উঠিয়ে দিয়েছিল ওদের। বলেছিল—চ চ কলেজস্ট্রিটে একবার টুঁ মেরে আসি। মোটে তিন দিনের জন্য

আসা। ঘুরব না? বই ফই নতুন কি বেরিয়েছে দেখে আসি। রাতের কোলকাতার চার্ম আলাদা।

অরুদার জেদেই হেঁটে হেঁটে কলেজস্ট্রিট যাওয়া ঠিক হয়েছিল। ওরা যখন আমহার্স্টস্ট্রিট ধরে হাঁটছিল অদিতি হঠাৎ বলল—অরুদা এত হাঁটাচ্ছ না? পা ব্যথা করছে।

—হাঁটলে হার্ট ভাল থাকে তা জানিস? কই অবন্তিকা তো কোন কমপ্লেন করছে না?

এপ্রসঙ্গ নিয়ে অদিতি আর কোন কথা বাড়ায় নি। ভীড় ঠেলে নোংরা জায়গা পাশ কাটিয়ে হাঁটছিল ওরা। যেতেযেতে দেশদশের কথা উঠল। অরুণোদয় বলল—পঞ্চাশবছর স্বাধীনতা পূর্তিতে আনন্দ করব কি? চোর জোচ্চর পরিবৃত ব্যাধিগ্রস্থ দেশটা যেন ধুঁকতে ধুঁকতে চলছে।

উত্তরে অবন্তিকা বলেছিল—তবু তার মধ্যে দু'চারজন সৎ লোকের দেখা মেলে বৈকি? শত অন্ধকারেও তারা জ্বালিয়ে রাখেন আশার আলো।

—বাঃ এতটুকু মেয়ে। বেশ কথা বলত অবন্তিকা। দেশের চর্চায় মন নেই অদিতির। সে এক রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে বলে উঠেছে—অরুদা হাঁটতে হাঁটতে দারুন খিদে পেয়েছে। আগে তো খেয়ে নি।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই অদিতি ঢুকে পড়েছিল রেস্টুরেন্টের ভেতর।

অর্ডার দিল অদিতি। মোগলাই পরোটা, কষামাংস। তিন কাপ চা। খাওয়াশেষে রেস্টুরেন্ট বয় বিল নিয়ে এলে দু'জনার নানা হাঁহাঁ শব্দের মধ্যেই বিল চুকিয়ে দিয়েছিল অবন্তিকা। কোন ফাঁকে সে পয়সা বের করেছিল কে জানে! অদিতি খানিক রেগে গিয়ে বলল—এটা কি তোর করা উচিৎ হল অবন্তী?

—যাঃ এটা কিন্তু তুমি খুব অন্যায় করলে—বলেছিল অরুণোদয়।

অবন্তিকা কখন যেন আশ্চর্যরকম স্মার্ট আর প্রগলভ হয়ে উঠেছে। খুব সপ্রতিভভাবে বলেছে—আপনি আমাদের অতিথি। একটু তো মওকা দেবেন?

—সেবা করনে কে লিয়ে? হা হা শব্দে হেসে উঠেছিল অরুণোদয়।

ভীড় গায়ে ঠেকছে না, হাঁটতে কষ্টই নেই। মনে হল অবন্তিকার, হাওয়ায় ভেসে চলেছে সে। খেয়াল করেছে অরুণোদয়ের চোখদুটো সেট্ হয়ে আছে তার মুখে। 'আকর্ষণ' শব্দটির প্রকৃত অর্থ এতদিনে যেন হৃদয়ঙ্গম করা যাচ্ছে।

অদিতি কবিতা পড়তে ভালবাসে। বই এর দোকানে ঢুকেই সে বলল সুভাস মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বই কিনবে সে।

—অবন্তিকা তুমি কি বই নেবে?

অরুণোদয়ের প্রশ্নে ও চুপ করে ছিল। আসলে সুপ্রচুর বই দেখলে খেই হারিয়ে ফেলা ওর অভ্যেস। মাথা গুলিয়ে যায়। বইমেলাতে গেলেও ঠিক এমনি হয়। এবার থেকে লিস্ট করে আনতে হবে—ভাবছিল ও। ওকে চুপচাপ দেখে অদিতির অরুদা নিজে থেকেই বলল—কোন বিখ্যাত সাহিত্যিকের রচনাবলী কেন না?

ঝট্ করে ক'দিন আগে শর্মিলার ডায়লগ মনে এল। বাবাকে বলছিল ওর মা—শুনছ তিন বন্দ্যোর মধ্যে বিভূতি মানিক আছে শুধু তারাশঙ্করের নেই।

মনে পড়তেই ও বলল—তারাশঙ্করের রচনাবলী। ঝক্‌মকে বিশালবপু তারাশঙ্করের নির্বাচিত রচনা এগিয়ে দিল দোকানি।

অবন্তিকা পাতা উল্টে দাম দেখে নিয়েছে—তিনশ টাকা। সঙ্গে সঙ্গে রেখে দিয়েছে।

—আরে রেখে দিলে কেন? টাকা নেই বুঝি?

—না মানে এই আর কি! থাক না—দেখি অন্য কোন বই?

ওর কথা থামিয়ে দিয়ে অরুণোদয় বলেছিল দোকানিকে—দিন দাদা প্যাক্ আপ করে দিন।

লজ্জায় কান লাল করে ফেলা অবন্তিকা প্রচণ্ড আপত্তি জানিয়েছিল। পাত্তাই দিল না অরুণোদয়। অবন্তিকা দেখেছে সে পাঁচশো টাকার নোট ভাঙ্গালো বইটার জন্যে।

সেদিন বাড়ি ফিরে এসেছিল অন্য অবন্তিকা। নিজেকে যেন নিজেই চিনতে পারছে না। দুর্দান্ত ভাললাগার অনুভূতি কি এইরকম হয়? খাওয়াতে মন নেই। পড়াতে মন নেই কথা বলতে মন নেই।

শর্মিলা তারাশঙ্করের বই দেখে ভীষণ খুশী। বইএর গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞেস করল মেয়েকে—হ্যাঁরে এত টাকা পেলি কোত্থেকে?

মেয়ের শূন্য দৃষ্টি নিরুত্তর মুখ দেখে বাংলায় এম. এ শর্মিলা ফুট্ কেটেছিল—রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা?/বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে/না শুনে কাহারো কথা?

সে রাতে ঘুম আসে নি অবন্তিকার। পরদিন ঘোরলাগা অবস্থায় কলেজে এসেছে। অদিতির সঙ্গে দেখা হবামাত্র সে বলেছে—অরুদা তোদের ঠিকানা নিয়েছেন। মনে হয় তিনি মরেছেন।

অর্থপূর্ণ হাসি হাসছিল অদিতি। তারপর বলেছিল—আর মাত্র একটা দিন। কাল রবিবার। পরশু সোমবার ভোরের ফ্লাইট ধরবে অরুদা। দেখে নিস্ কাল ঠিক যাবে তোদের বাড়িতে।

আজও অবন্তিকার চোখে ঘুম নেই। শরীরে জ্বরোভাব। সুগভীর উত্তেজনাকে ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। তবে বোঝা যাচ্ছে কখন যেন তার অহঙ্কারের দানাগুলো গলে গলে জল হয়ে গেছে। বুকে একটানা ভ্রমরগুঞ্জন—সে আসবে সে আসবে। ঠিক ঘুম নয় তন্দ্রামত এসেছিল ভোরের দিকে। বেল বাজতে লাফিয়ে উঠে দরজা খুলল অবন্তিকা। কাজের মেয়ে অবাক—দিদিমুনি তুমি? পোকা খাওয়া ক্ষয়া দাঁতের একরাশ হাসি ছড়িয়ে ঘরে ঢুকেছিল মোক্ষদা। এক এক করে কাগজওয়ালা, দুধওয়ালা, সব্জীওয়ালা, তাসুড়ে পিতৃবন্ধু বিমান কাকু প্রত্যেককে দরজা খুলে

দিয়েছে অবন্তিকা। যখন সন্ধ্যে গড়িয়ে গেল অথচ সে এল না—গভীর হতাশা এবং ক্লান্তিবোধে জর্জরিত হতে থাকল অবন্তিকা। শরীর খারাপের অজুহাতে শুয়ে পড়েছে অসময়ে। অস্থিরতা বড়তে থাকে। সন্দেহ হয় তবে কি বিফল হল প্রথম প্রেমের প্রস্ফুটিত ফুল? বেল বাজছে। দরজা খোলার উৎসাহ নেই। শর্মিলা দরজা খুলল। শুয়ে থাকা মেয়েকে ঠেলা মেরে বলল—এই ওঠ, কে একটি ছেলে ডাকছে তোকে।

অনেক রেলগাড়ির একসঙ্গে ছোটার শব্দ শুনতে শুনতে অবন্তিকা দরজার সামনে এল। আবীর মাখা মুখে তাকিয়েছে। অরুণোদয়। বিব্রতমুখে দাঁড়িয়ে আছে। যা বোঝবার বুঝে গিয়েছে সে। এসব কথা ব্যক্ত করতে লজ্জা আসবেই—তা সে যত বড় ব্যক্তিত্বই হোক না কেন। অবন্তিকা সংযত এবং নিচুস্বরে বলল তাকে—আসুন। ভেতরে এসে বসুন।

—না না এখন বসবার সময় নেই।

কব্জী উল্টে ঘড়ি দেখতে দেখতে বলল—তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি অবন্তী। বলতে লজ্জা লাগছে।

অবন্তিকা পূর্ণ চোখে তাকাল ওর দিকে। চোখাচোখি হল না। কারণ মাটির দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

কাঁপাস্বরে বলল অবন্তিকা—বলুন না?

—মানে বই কেনবার জন্য তোমাকে যে তিনশ টাকা দিয়েছিলাম তা যদি এখনই দিতে পার খুব সুবিধে হয়। আসলে এলেবেলে খরচ করে পকেটের অবস্থা প্রায় শূন্য।

লম্বা চওড়া, স্মার্ট সুচাকুরে রোমান্টিক যুবকটিকে চোখের সামনেই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যেতে দেখল অবন্তিকা। উড়ে যাচ্ছে সব ক'টি টুকরো তাণ্ডবকরা ঝড়ো হাওয়ায়। বদলে কালো রঙের একটি সর্ষেদানা নাচছে চোখের সামনে। সর্ষেদানাকে উদ্দেশ্য করে বলছিল অবন্তিকা—এক্ষুনি দিচ্ছি। সামান্য ওয়েট করুন।

পরদিন সুশান্ত বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল কমনরুমে। সিক্ত পদ্মমুখ অবন্তিকাকে দেখতে পেয়েছে সামনে।

—কি ব্যাপার অবন্তিকা? অদিতিকে খুঁজছ?

—না আপনাকে।

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে সুশান্ত। তার মুখ থেকে একটি মাত্র শব্দ নির্গত হয়—কেন?

আর পাঁচজনের সামনেই সুশান্তর চোখে চোখ রেখে অবন্তিকা বলল—আপনার কবিতার খাতাটা দেবেন বলেছিলেন না?

বৃত্ত

অমিতাভর বাড়ির সামনের দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পুবদিকে তাকালেই বয়স্ক বিশালাকার আমগাছটির দিকে নজর পড়ে যায়। আমগাছের দুপাশ ঘেষে দু'চারটি নারকেল একটি সুউচ্চ তালগাছ। এছাড়া শিশু আম জাম কাঁঠাল অন্যান্য বিবিধ গাছের সবুজ যাদের পরিচিতি এখনও যোগাড় করে উঠতে পারেনি নি ইন্দ্রাণী। বারান্দার সামনে অমিতাভ ইন্দ্রাণীর হাতে গড়া ফুলের বাগান। হলদে গোলাপি লাল রঙের জবার প্রস্ফুটিত মুখগুলোয় এখন ভোরের স্নিগ্ধতা মাখানো। এছাড়া গন্ধরাজ রজনীগন্ধা নানা রঙের গোলাপ দোপাটি জিনিয়ার সমারোহ বাগানের সৌন্দর্যে একটি আলাদামাত্রা এনে দিয়েছে। রোজকার মত প্রজাপতি ও পাখিদের মেলা। বিপুল ব্যস্ততা ওদের ওড়াউড়িতে। পাখিদের নানা সুরের কনসার্ট খোলামেলা প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে দারুন মানানসই। উঠি উঠি সূর্যের হাল্‌কা আলোয় চারপাশ বিধৌত। এখনও দেখা যায় নি ঘুমভাঙ্গা সূর্যের লালরঙা গোলাকার মুখ। ইন্দ্রাণীর একাগ্রদৃষ্টি ঘনসংবদ্ধ আমগাছটির দিকে। তার ফাঁকফোঁকর গলে এবার দেখা দেবেন তিনি। ঘূর্ণায়মান ভূগোলোকের গতিবিধির কারণে বিভিন্ন ঋতুতে জায়গাবদল করতে হয় তাকে তা লক্ষ করে দেখেছেন ইন্দ্রাণী।

এ সময় প্রকৃতির সঙ্গে তার অদ্ভুত একাত্মতাবোধ এসে যায়। শরীরের অণুপরমাণুতে রণিত হতে থাকে এক অনির্বচনীয় সঙ্গীতের গুঞ্জনধ্বনী। দু চারমিনিটের মধ্যেই উঠে এসেছে লাল গোলক। দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র ইন্দ্রাণীর দু'হাত প্রণামের ভঙ্গীতে উঠে আসে কপালে। তাঁর মুখনিঃসৃত সোচ্চার সূর্যস্তব বিছানার ভেতর শুয়ে থেকেও পৌঁছে যায় অমিতাভর কানে।

ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্‌
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরম।

এমনিতে ইন্দ্রাণীর পুজোপাঠে খুব যে একটা মন আছে তা নয়। কেবল সূর্যের প্রতি তার অসম্ভব মোহ বা আকর্ষণের কথা জানেন অমিতাভ। তাই হয়ত ইন্দ্রাণীর মন্ত্রোচ্চারণ শুনে মনে হয় অন্তরের অন্তস্থল থেকে উচ্চাবিত হচ্ছে সূর্যস্তব। ফিরে এসে ইন্দ্রাণী চায়ের জল চাপিয়েছেন রান্নাঘরের টুং টাং শব্দই তা জানিয়ে দেয় অমিতাভকে। টের পেয়েই শয্যাত্যাগ করেছেন অমিতাভ। বাসীমুখে বেডটি খাওয়া ভীষণ অপছন্দ ইন্দ্রাণীর। স্বাস্থ্যসম্মত এই নির্দেশবাক্যটি এককথায় মেনে নিয়েছেন

অমিতাভ। দ্রুত মুখ ধুয়ে এসে বসেছেন টেবিলে। সামনে ধূমায়িত চায়ের কাপ রেখে এখন শুরু হবে কর্তাগিন্নীর সুখদুঃখের আলাপচারিতা। তবে অন্যমনস্কতা ইন্দ্রাণীর স্বভাবের মধ্যে এসে গেছে। এখন যেমন ঘরের খোলা দরজায় তার চোখ। উঠোনে এই সাতসকালে সাত ভায়রার হুটোপুটি দেখছেন দারুন মনসংযোগে। এদের দলে গুণে গুণে থাকে সাতটি পাখি। ধূসর রঙের কিছুটা মোটাসোটা গড়নের পাখি। ক্যাচোড় ম্যাচোড় করা এদের স্বভাব। এসব তথ্য ইন্দ্রাণীর কাছ থেকেই পাওয়া অধ্যাপক অমিতাভর।

—শুনছ? এ বাড়ি বিক্রি করে কিনব নাকি কোলকাতায় দু'কামরার ফ্ল্যাট?

কথা শুনে খোলা দরজা থেকে স্বামীর দিকে চোখ রেখে বলে উঠেছেন ইন্দ্রাণী, বারবার এরকম খোঁচা দিয়ে কথা বল কেন বলত?

রাগলে এ বয়সেও ইন্দ্রাণীর মিষ্টি মুখের সৌন্দর্য হৃদয় ছুঁয়ে যায়। ভাবতে হয় অমিতাভকে এ জায়গার মাটি বাতাস জলে মিশে যাওয়া ইন্দ্রাণীর সঙ্গে পূর্বের ইন্দ্রাণীর কী আকাশ পাতাল তফাৎ। উত্তর কোলকাতার পলেস্তারা খসা ভাড়াবাড়ির ছোট ছোট অন্ধকার ঘরের চৌহদ্দীর মধ্যে কী এমন মোহের সঞ্চার হয়েছিল বুঝে উঠতে পারা যায় নি। শহর কোলকাতা থেকে অনেকটা দূরে বর্ধমান জেলায় গ্রামাঞ্চলের ভেতর এই জমি সহকর্মী অধ্যাপক সুবীর মিত্রের প্ররোচনায় কেনা হয়েছিল। বুঝিয়েছিল সে রিটায়ারের পর এমন শান্ত সুন্দর জায়গা শান্তি এনে দেবে জীবনে। সেই সুবীর আমেরিকায় পারি দিয়েছে কবে। ক্যালিফোর্নিয়ার কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যুক্ত আছে সে। বাড়ি গাড়ি আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার সব উপকরণের ভেতর বুঁদ হয়ে দিন কাটাচ্ছে। এমন কি এক আমেরিকান ললনার পাণিগ্রহণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাঙ্গালিত্ব মুছে যাবার সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। মাঝে মধ্যে ওর চিঠি পাওয়া যায়। উচ্ছ্বাসভরা চিঠিতে এমন কটা শেকড়ছেড়া ব্যথার বাক্য থাকে তাতে মনে হয় সব প্রাপ্তির ভেতর কোথায় যেন বিষাদ সমুদ্র থমকে আছে।

অমিতাভ যখন অধ্যাপনার কাজে ঢুকেছিলেন সেসময় অধ্যাপকদের মাসিক আয় ছিল নগণ্য। বাড়িতে দু'একজন বাড়তি পুষ্যি। এছাড়া আত্মীয়স্বজন কোলকাতায় এলে এ বাড়িতে তাদের ওঠা ছিল নিয়মমাফিক। হাসিমুখে সবকিছু সামলে দিতেন ইন্দ্রাণী। কোন অভিযোগ ছিল না। শান্তশিষ্ট হাস্যমুখী গৃহিনীর তত্ত্বাবধানে কোন পুরুষ না সুখী হয়? অল্পবয়সে সস্তায় গ্রামে জমি কেনা নিয়ে দুজনা'র ভেতর নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্তা হয়েছিল।

বলেছিলেন ইন্দ্রাণী—ওসব গ্রামেগঞ্জে খবরদার বাড়ি করো না। শতেক ঝামেলা হবে। তাছাড়া কোলকাতা ছেড়ে থাকা কখনই সম্ভব হবে না। সব দরকারই তো কোলকাতায়।

—পাগল নাকি যে ওখানে বাড়ি করব? দাম বাড়লে জমি বেঁচে দেওয়া যাবে। সুবীর আমায় ফাঁসিয়ে দিয়ে নিজে দিব্যি উড়ে বেরিয়ে গেল। তবে জমিটা থাক। কথায় বলে না জমি খাটি শাড়ি মাটি!

নিশ্চিন্ত ছিলেন ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রনীল ওদের একমাত্র ছেলে। নামী স্কুল দামী মাস্টার ভালো পোষাক এসব করতে গিয়ে অধ্যাপক অমিতাভর পকেট ফাঁকা হতে থাকে। এছাড়া পোষ্য আর আতিথেয়তার চাপ তো ছিলই। এরপর ইন্দ্রানীলের উচ্চশিক্ষালাভের জন্য বিদেশযাত্রায় বেশ কিছু টাকা হাত ছাড়া হয়েছিল। বছর চারেক পর তার ফিরে আসা, ব্যাঙ্গালোরে চাকরি পাবার পর স্বখরচায় বৌমা তনুশ্রীকে ঘরে আনা, পরপর ঘটনাগুলি সংঘটিত হবার পর অমিতাভর রিটায়ারের দিন ঘনিয়ে এল। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে বেশ কিছু টাকা তোলা হয়ে গেছে। ইনসিওরেন্স, কিছু শেয়ার কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা থাকল তাতে কোলকাতায় ফ্ল্যাট কেনা কোনমতেই সম্ভব নয়। কষ্টে সৃষ্টে কিনে ফেললেও ভবিষ্যতের জন্য হাতে কিছুই থাকবে না। ভেঙ্গেপড়া পুরোন ভাঙ্গাবাড়ির ওপর কর্পোরেশনের নোটিশ ঝুলছে। ইন্দ্রানীলের নতুন সংসার। তার কাছে হাত পাততে কেমন বাধো বাধো ঠেকছে। সব কিছু চিন্তা করে সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেললেন অমিতাভ। শান্তশিষ্ট ইন্দ্রাণীর রুদ্রমূর্তি সেই প্রথম দেখেছিলেন অমিতাভ। বুঝেছিলেন অমিতাভ, এতদিনের লালিত স্বপ্নভঙ্গের বেদনা সহ্য করতে পারছেন না ইন্দ্রাণী। বলেছিলেন—গ্রাম বাংলায় পোকামাকড়ের ভেতর থেক তুমি। মরে গেলেও সেখানে যাব না আমি।

—উপায় নেই ইন্দু। বুঝতে চেষ্টা কর। এখানে ফ্ল্যাট কিনলে খাবার পয়সা থাকবে না।

—কেন? ফুঁসে উঠেছিলেন ইন্দ্রাণী, ছেলেকে এত পয়সা খরচা করে মানুষ করেছ বাবামা'র খাবার পয়সা সে দেবে না?

—বছর দুই হল সে ব্যাঙ্গালোরে আছে। আমেরিকা থেকে আশা করা যায় ভালাই টাকা সে এনেছে। এ পর্যন্ত সে ক'হাজার টাকা তোমায় দিয়েছে?

—দরকার হয় নি। তাই সে দেয় নি। বাবা মা না খেতে পেয়ে মারা যাবে আর সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে? এতটা নিচে নীলকে নামিও না তুমি।

—মানলাম। কিন্তু আন্দাজের ওপর নির্ভরতা চলে না ইন্দু।

কেমন যেন ক্ষ্যাপাটে হয়ে উঠেছিলেন ইন্দ্রাণী। কথায় কথায় চোখে জল। একদিন তো ভাতই খেলেন না। অভিজ্ঞ অমিতাভ গৃহ অশান্তিকে আমল না দিয়ে বাড়ির কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। সে সময় কী হ্যাঁপাই না তাকে সামলাতে হয়েছিল। আর এখন? তাকিয়ে দেখলেন অমিতাভ উড়ে যাওয়া সাতভায়রার

বদলে লিচু গাছের ডালে দোয়েল আর বুলবুলির শীস শুনতে ব্যগ্র ইন্দ্রাণী কাপ হাতে খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে।

একদিন বাগানের মেঝেবাঁধানো কলের চারপাশের মাটিতে খুরপি চালিয়ে ইন্দ্রাণীকে ছোট ছোট গর্ত খুড়তে দেখে অবাক অমিতাভ জিজ্ঞেস করেছিলেন

—কী হচ্ছে কী? গাছ লাগাবে নাকি?

ব্যস্ত ইন্দ্রাণী বলেছিলেন কী যে বল? এখানে গাছ গজাবে নাকি? দেখছ না জায়গাটা ইট পাথর ঠাসা?

—তবে?

ভীষণ সিরিয়াস ইন্দ্রাণী বলে উঠেছিলেন কিরকম গরম পড়েছে। চড়ুইগুলো স্নান করবার জল পায় না। ওদের স্নানের জল দেবার জন্য গর্ত খুড়ছি।

হাসি চেপে বলেছিলেন অমিতাভ—ওঃ পক্ষীকুলের পুকুর?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

ইন্দ্রাণীর ঢেলে দেওয়া জলভর্তি গর্তগুলোতে চড়ুই পাখিদের হুড়োহুড়ি স্নানপর্ব দেখে অধ্যাপক অমিতাভর বিস্ময় আকাশ ছুঁয়েছিল। দিনগুলো যেন ডানায় ভর করে উঠে চলছিল। শহুরে ইন্দ্রাণী যে এমনভাবে প্রকৃতি প্রেমে হাবুডুবু খাবে কে জানত? অবশ্য স্ত্রীর প্রকৃতি প্রেমের ছোঁয়ায় তিনিও কি কাবু হন নি? বছরের পর বছর গড়িয়ে যেতে মনের ভিত্তি যেন আরও দৃঢ় হচ্ছে। ইতিমধ্যে ইন্দ্রনীল ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে চেষ্টাচরিত্র করেই বোধ হয় কোলকাতার এক মাল্টিন্যাশনাল ফার্মে চলে এসেছে। কোলকাতায় এলে মা বাবাকে মাঝেমধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে এমন একটা আভাস পাওয়া গিয়েছিল পুত্র এবং পুত্রবধূর কাছ থেকে। ভেবেছেন অমিতাভ, আজকালকার কেরিয়ারিস্ট ছেলেরা বাংলার বাইরে থেকে যেতেই ইচ্ছুক। পশ্চিমবাংলায় উন্নতির সুযোগ যে কত কম তা কি তিনি জানেন না? ইন্দ্রনীল বাবা মা'র কথা ভেবে স্বার্থত্যাগ করেছে ভেবে স্বস্তি এসেছিল মনে। যদিও নীল ক্যালকাটা অফিসে প্রায় টপ্‌মোস্ট পজিশানে আছে। প্রতি শীতে ছেলে-মেয়ে নিয়ে ওরা কিছুদিন এখানে কাটিয়ে যায়। গরমের ছুটিতে দার্জিলিং নৈনিতাল বা কুলুমানালি এসব ঠাণ্ডা জায়গায় ঘুরে আসে। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তার পুত্রবধূর সম্পর্ক অতি মধুর। ছেলে বৌরা এলে প্রকৃতিপ্রেম উঠে যায় ইন্দ্রাণীর। মেতে ওঠেন ওদের নিয়ে। দিনরাত রান্নাঘরে নানা সুস্বাদু খাবারের সুগন্ধ হাওয়ায় ভাসে। তনুশ্রী তার বড় বড় চোখ আরও বড় বড় করে বলে—সত্যি বলছি মা এত হোটেল এত জায়গায় খেয়েছি আপনার হাতে তৈরি এরকম স্বাদের কচুরী, ডিমের ডেভিল আর পুলিপিঠের কোন তুলনা পাই নি। সবাইকে আমি বলি বহু জন্মের ভাগ্যে এমন শাশুড়িমা পেয়েছি। পাপলু ঝুমির আনন্দ বাঁধনহারা। তবে মার কড়া নির্দেশে

ওদের ফড়িং বা প্রজাপতি ধরা একদম মানা। ইন্দ্রানীল গার্ডেন চেয়ারে বসে বাগানের রূপ অবলোকন করতে করতে ঘণ্টা ধরে গল্প করে বাবার সাথে। সবুজ বনানী ঘেরা রাস্তা ধরে হেঁটে আসে সকাল বিকেলে। অমিতাভ আর ইন্দ্রাণীর কোলকাতায় আর যাওয়া হয় কই? এই ক'বছরে মাত্র বার তিনেক যাওয়া হয়েছে। শীত গরমের ছুটি ওদের নিয়মে বাঁধা। সে কারণে নাতিনাতনির স্কুল খোলাকালিন যেতে হয়েছে। বাচ্চাদের পড়া নাচ গান তবলার স্কুল নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে তনুশ্রী যে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দু'দণ্ড বসে কথা বলার সময়ও থাকে না। পাঁউরুটি মাখন ডিমসেদ্ধ দিয়ে ভোরের শুরু। তারপর ঠিকে রাঁধুনি অতিরিক্ত হলুদ সহযোগে একই স্বাদের ডাল ঝোল তরকারি রেঁধে দিয়ে যায়। অতঃপর তনুশ্রীর ছেলেমেয়েকে নিয়ে আসা যাওয়া করতে করতে রাত শুরু হয়। তাদের থাকার মাঝে শনি কি রবিবার পড়ে গেলে সবাইকে ইন্দ্রনীল অম্বর বা কোয়ালিটি-ইন-এ খাইয়ে আনে। শহুরে কৃত্রিমতায় হাঁফ ধরে যায় ইন্দ্রাণীর। সাতদিনের জন্য থাকতে গিয়ে তিনবারই দিন চারেকের মাথায় পালিয়ে এসেছিলেন।

চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে অমিতাভ বলে উঠেছেন, আশ্চর্য আমি সামনে থাকতে দোয়েল বুলবুলি তোমার বেশী আপন হল?

—না বাপু না। আমি ভাবছি অন্যকথা।

—কার কথা?

—নীলের কথা। অনেকদিন ওদের চিঠি পাই না। এবার গরমে ওরা কোথায় যাবে কে জানে!

—যেখানেই যাক না, ইন্দ্র কী বলে জান? এত জায়গা ঘুরে এসেছি। এ জায়গার ন্যাচারাল বিউটির তুলনা নেই। সাধে কি রবিঠাকুর লিখেছেন—

—বহুদিন ধরে, বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়াছি পর্ব্বতমালা
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।

অধ্যাপক অমিতাভর গলা এ বয়সেও গমগমে। তার আবৃত্তি এক ঝট্‌কায় ইন্দ্রাণীকে নিয়ে যায় সুদূর স্মৃতিতে। কলেজ ফাংশনে যুবক অমিতাভর আবৃত্তি শুনতে শুনতে যখন অল্পবয়সী ইন্দ্রাণীর বুক ভরে যেত আনন্দে গর্বে।

জলখাবার খাওয়ার আগে অমিতাভ খুরপি নিয়ে বসে যান বাগানে। কিছুক্ষণ তদারকির পর খিদে চাড়া দিলে উঠে পড়েন। ইন্দ্রাণীর অনেক কাজ সকালে। বেলায় সময় হলে বাগানে টুকিটাকি কিছু করেন—না হলে সে সময় মালী এলে নির্দেশ দেন তাকে। বিকেলের দিকে খুরপি হাতে ইন্দ্রাণীকে ঘুরতে দেখা যায় বাগানে। জলখাবার বলতে সকালে হাতে গড়া রুটি আলু ছেঁচকি। মাঝে মধ্যে অমিতাভ গোঁ ধরলে লুচি পরোটা করে থাকেন ইন্দ্রাণী। জলখাবার রেডি করে ঘরের সাত সতেরো কাজে হাত লাগিয়েছিলেন ইন্দ্রাণী। সব সেরে টেরে স্নানের ঘরে ঢোকেন। আজ বাথরুমে ঢোকার আগে মনে হল ইন্দ্রাণীর অমিতাভ এখনও জলখাবার খেতে আসে নি। এ বয়সে এতক্ষণ এক নাগাড়ে কি কাজ করা ভাল? মাথায় তেল ঠাসতে ঠাসতে নিশ্চিন্ত মনে বাগানে পা রাখতেই ইন্দ্রাণীর তীব্র চিৎকার সুন্দর সকালটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। অমিতাভ ফুলের বেডেই চিৎ হয়ে পড়ে আছেন। ঠোটের পাশে ফেনা জমে রয়েছে।

ওখানকার নামী ডাক্তার শ্যামল ঘোষালকে পাশের বাড়ির বস্ত্রব্যবসায়ীর ছেলে রঞ্জন ডেকে এনেছিল। ডাক্তার বোসের ইন্‌জেক্‌শনে জ্ঞান ফিরে এসেছিল অমিতাভর। এখন ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে তাকে। সব দেখে টেখে ডক্টর বোস বলেছিলেন মনে হচ্ছে সিন্‌কোপাল অ্যাটাক্। ওনাকে এখানে রাখা চলবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোলকাতায় নিয়ে যেতে হবে। যদ্দুর মনে হচ্ছে পেস্‌মেকার বসাতে হবে।

প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক ইন্দ্রাণীদের। সবাই ছুটে এসেছে খবর পেয়ে। রঞ্জন ওখানকার বড় স্টেশনারী দোকান থেকে ফোন করে খবর আনল। বলল, মাসিমা বৌদি ফোন ধরেছিল। বলল ইন্দ্রদা ট্যুরে গেছে।

—তাহলে? কি হবে রঞ্জন?

—আমি আপনাদের নিয়ে যাব। রেডি হয়ে নিন। বিকেলের ট্রেনেই যাবেন তো? ডাক্তার বোস অমিতাভর তাৎক্ষণিক সুস্থতার জন্য অ্যালুপেন্ট ট্যাবলেট খাওয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও রঞ্জনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠেছে। নিজের ছেলের মত পাশ এসে দাঁড়িয়েছে সে। সারা শরীরে নার্ভাসনেসের কাঁপুনি বহন করতে করতে ইন্দ্রাণী জিনিসপত্র গোছানোয় মন দিল। মনে মনে স্থির জেনেছেন স্বামীর চিকিৎসার জন্য এবারে তাকে বেশ কিছুদিন কোলকাতায় থাকতে হবে।

ট্যাক্সিতে ওঠার মুহূর্তে শারিরীক দুর্বলতা তাকে বুঝিয়ে দিল সেই কোন সকালে চা বিস্কুট ছাড়া তার পেটে আর কিছু পড়ে নি।

ট্রেনে উঠে দুর্বলতা এবং দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও কিছুটা নিশ্চিন্তভাব ফিরে এসেছিল ইন্দ্রাণীর মনে। তিনি একা নন। পুত্রের ছত্র-ছায়ায় যাচ্ছেন। এই নির্ভরতা বোধ তাকে আস্বস্ত করেছে খানিকটা।

ট্রেন ঘণ্টাখানেক লেটে এসেছে। রাত প্রায় বারোটা। বেল বাজতে দরজা খুলেছে তনুশ্রী। এতক্ষণের চেপে রাখা টেনশন মুহূর্তে বেড়িয়ে আসে। ওকে দেখামাত্র ফুঁপিয়ে উঠেছেন ইন্দ্রাণী।

—আহা কাঁদবার কি আছে? আসুন ভেতরে আসুন। তনুশ্রীর জমাটবাঁধা কণ্ঠস্বর কিছুটা ধাক্কা মারে ইন্দ্রাণীকে। পরক্ষণেই চিন্তার মোড় ঘুরে যায়। বৃদ্ধ স্নেহময় শ্বশুরের এ অবস্থায় কী তনুশ্রী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে?

ইন্দ্রনীলের আবির্ভাবে চমক লাগে ইন্দ্রাণীর বলেন ট্যুর থেকে আজই কি ফিরে এলি? কী বিপদ বল দেখি? মা'র কথার উত্তর না দিয়ে ইন্দ্রনীল তনুশ্রীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছে। সে কিছু বলবার আগেই তনুশ্রী বলে উঠেছে, বলিনি তো ট্যুরে গেছে বলেছিলাম যেতে পারে।

রঞ্জন এসে দাঁড়িয়েছে। —দাদা এদিকে আসুন। মেসোমশায়কে একটু ধরতে হবে।

দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে বিদ্ধস্ত অমিতাভকে দেখামাত্র বুকের ভেতর দোমড়ানো ব্যথা ইন্দ্রাণীকে যেন নিঃশেষিত করে দেয়। আজ সকালে এই লোকটাই তো তাকে গমগমে স্বরে আবৃত্তি শুনিয়েছিল না?

খাটে শুইয়ে দিতে দিতে নীল বলেছিল, বাবার এ অবস্থা হল কি করে?

—কিন্তু বুঝতে পারি নি নীল। হঠাৎ একেবারে আচমকা ঘটনাটা ঘটে গেল। সকালে খুরপি হাতে....

—আপনারা কি খেয়ে এসেছেন? না কিছু করতে হবে? এত রাতে কী বা দেব?

কথা বলায় বাধাপ্রাপ্ত ইন্দ্রাণী তনুশ্রীকে দেখছেন। সাদা সূক্ষ্ম লেসের লাইনিং দেওয়া নাইটি পরিহিতা তার সুন্দর মুখ এবং কথার ধারা কিরকম যেন অচেনা লাগে। ইন্দ্রাণী বলে উঠেছেন, আমরা কেউ কিছু খাইনি তনুশ্রী। তবে ডিম পাঁউরুটি থাকলে রঞ্জনকে দাও। হরলিক্স আর বিস্কুট এনেছি। ওনাকে দেব, আমিও খেয়ে নেব।

বাথরুমে ক্লান্ত অভুক্ত ইন্দ্রাণী চোখেমুখে জল দিতে দিতে ভাবতে থাকেন কিছুদিন আগের কথা। খবর না দিয়ে মা বাবাকে চমকে দেবে বলে ওরা একবার অসময়ে পৌঁছেছিল ওখানে। ওদের কাপড় ছাড়া স্নান করার অবসরে মাত্র আধঘণ্টার ভেতর ইন্দ্রাণী ওদের গরম খিঁচুড়ি ওমলেট পাঁপড় ভাজা রাত্রের জন্য

করে রাখা পায়েস দিয়ে থালা সাজিয়ে দিয়েছিলেন। তনুশ্রী খেতে খেতে বলেছিল, মা আপনার তুলনা নেই। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতে, ইন্দ্র বলেছে, তা ডাক্তারবাবু কি বললেন?

—বলেছেন সিন্‌কোপাল অ্যাটাক। খুব সম্ভব পেস্‌মেকার বসাতে হবে।

ও বাবা! সে তো অনেক টাকার ধাক্কা। ওখানকার ডাক্তার আবার ডাক্তার নাকি? বাবার শরীর দেখে তো তেমন কিছু সিরিয়াস মনে হচ্ছে না।

—তনু তুমি কিন্তু অতিরিক্ত কথা বলছ।

ইন্দ্রনীলের ধমকানিতে তনুশ্রী ঘর থেকে বেড়িয়ে গিয়েছিল।

আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে ইন্দ্রাণীর। ছেলের ওপর ভরসা জাগে। বলেছেন ইন্দ্রাণী, তোর বাবাকে নিয়ে কাল সকাল দশটা নাগাদ বেরোতে হবে নীল। ডক্টর বোস তার জানা হার্ট স্পেশালিষ্ট ডক্টর প্রবাল মৈত্রের ঠিকানা দিয়েছেন। চিঠিও লিখে দিয়েছেন। তাড়াতাড়ি চিকিৎসা শুরু না করলে যে কোন মুহূর্তে বিপদ হতে পারে।

রাত প্রায় একটা। ক্লান্ত বিদ্ধস্ত ইন্দ্রাণীর চোখে ঘুম নেই। মনের আনাচে কানাচে অনেক মন ছোট করা ভাবের আমদানি। প্রায় বারো বছর চাকরি করছে নীল। এ পর্যন্ত তাঁরা এক পয়সাও দাবী করেন নি। এতবার গ্রীষ্মের ছুটিতে ওরা নিজেরা বেড়িয়ে এসেছে। মা বাবাকে কি কোনদিন বেড়াতে যাবার প্রস্তাব দিয়েছে! যতবার ওরা ইন্দ্রাণীর কাছে গেছে আন্তরিক আদরযত্নে কি তিনি ওদের ভরিয়ে দেন নি? যখন কোলকাতায় এসেছেন তারা তনুশ্রীর ব্যবহারে কি কোন আন্তরিক আপ্যায়নের ভাব দেখেছেন? নিজে থেকে কোন সৌখিন খাবার করে সে কি খাইয়েছে তাদের? একমাত্র তাদের ওখানে গেলেই তনুশ্রীর মৌখিক ভালবাসার জোয়াড়ে তারা ভেসে যেতেন। আসলে হয় তো সব বুঝেও কিছু না বোঝার ভান করে এতদিন কাটিয়েছেন তিনি।

সকালবেলা ইন্দ্রকে জামাকাপড় পরে তৈরি হতে দেখে ইন্দ্রাণী বলেছিলেন এত সকালে তৈরি হলি যে। সাড়ে ন'টাতে গেলেও চলবে। মাথা নিচু করে ইন্দ্র জুতোর ফিতে বাঁধে। মুখ তোলে না। স্বামীর হয়ে তনুশ্রী বলে ওঠে, আজ ওর কম্পানির ডিরেক্টরের সঙ্গে জরুরী মিটিং আছে। উঠে দাঁড়িয়েছে ইন্দ্র। সামান্য অপ্রতিভ মুখের ভাব। বলেছে সে—আজ তোমরা রঞ্জনকে নিয়ে যাও। উনি কী বলেন তা জেনে আমি সব ব্যবস্থা করব। তাড়াতাড়ি ফিরতে চেষ্টা করব। কী অদ্ভুত ছন্দপতন! অমিতাভর অসুস্থতা কোন দুঃশ্চিন্তার ছায়া ফেলেনি ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। তবে বুঝে ফেলেছেন ইন্দ্রাণী, নিজেকে শক্ত রাখা তার একান্ত প্রয়োজন।

সেদিন ডাক্তার দেখিয়ে ভরদুপুরে ওরা ফিরে এসেছিল। ডাক্তার বোসের আশঙ্কাই সত্যি। পরদিন দশটায় পি জি তে ভর্তি করবার পরমার্শ দিয়েছেন ডক্টর মৈত্র।

রঞ্জন ছেলেটা অনেক করেছে তাদের জন্য। ছেলেটি তাদের ব্যবসা দেখাশোনা করে। ওকে আটকে রাখবার কোন মানে হয় না। তবুও রওনা হবার আগে রঞ্জন বলেছে দরকার হলে খবর দেবেন মাসিমা। সঙ্কোচ করবেন না। ইন্দ্র তার অফিস থেকে ফোন করে খবর নিয়েছে। কথামত ফিরে এসেছে দুটোর মধ্যে। গরমকালে ঝুমি পাপলুর স্কুল সকালে। ওরা এখন তাই বাড়িতে। তনুশ্রী ছেলেমেয়ের সঙ্গে খেয়ে নিয়েছে। মা ছেলেতে খেতে বসেছে। বলল ইন্দ্র—আসছে কাল ছুটি নেব ভাবছি। ইন্দ্রাণীর চোখ জ্বলে। এতক্ষণে যেন বিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন ছেলের ওপর।

খাওয়া থামিয়ে বলেন—পেস্‌মেকারের অনেক দাম ইন্দ্র। তিনরকম রেঞ্জের কথা বলেছেন ডক্টর মৈত্র। ইন্ডিয়া মেড একটা হাজার ত্রিশ দাম আর একটা পঞ্চান্ন হাজার দামের আছে। ফরেন মেড পেস্‌মেকার বসাতে গেলে লাখ টাকার ধাক্কা। ডাক্তার মৈত্র পঞ্চান্ন হাজারেরটাই বসাতে বললেন।

হাতায় ভাত তুলে তনুশ্রী বলল নীলকে, আর ভাত দেব?

—না।

হাতা নামিয়ে রেখে সে বলেছে—আচ্ছা ঝুমির খবরটা জানিয়েছ মাকে?

ঝক্‌মকিয়ে উঠেছে ইন্দ্রর মুখ। ভাতের গ্রাস তুলতে গিয়ে নামিয়ে রেখেছে। সেকেন্ড টারমিনালে ঝুমি দুর্দান্ত রেজাল্ট করেছে। দুটো বিষয় ছাড়া সব বিষয়ে ফার্স্ট এসেছে। পাপলুটা পড়ে আছে দিদির নিচে। ওর পজিশন থার্ড।

—কেন স্কুলের হেডমিস্ট্রেস ঝুমির সম্বন্ধে কি বলেছে বললে না?

চশমার ভেতর দিয়ে ইন্দ্রনীল স্ত্রীর দিকে তাকায়।

—হ্যাঁ কী বলেছে যেন?

—বারে রেজাল্ট আনবার দিন তো হেড্‌মিস্ট্রেস আমাকে ছাড়তেই চাইছিলেন না। বললেন ঝুমির মত মেরিটোরিয়াস মেয়ে ওদের স্কুলে এর আগে আর কখনো আসে নি। অঙ্কের টিচার সুরঞ্জনা মিত্র তো বলেই দিলেন ওরা সবাই এখন ঝুমির দিকে তাকিয়ে আছেন। ঝুমিই ওদের স্কুলের নাম রাখবে বলে ওদের ধারণা।

আহ্লাদে তনুশ্রীর স্বর গুব্‌গুব্ করে। একটি দশ বছরের মেয়ের দিকে সারা স্কুল তাকিয়ে আছে যুক্তিটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না ইন্দ্রাণী।

নীল পাতের শেষ গ্রাস মুখে তুলতে তুলতে বলে, কাল ঝুমির গানের কী একটা পরীক্ষা আছে না?

—আর গান? প্র্যাক্‌টিসের সময় চাইতো। বারবার এত ডিস্‌টারবেন্স ভাল লাগে? কাল বিকেলে পাপলুরও তো তবলার পরীক্ষা আছে।

তনুশ্রীর ভুরু কুঁচকে আছে। ইন্দ্রনীল আমের ঝোলে চুমুক দিয়ে বলে ওঠে, ঝুমি আজকাল দারুন গাইছে জান মা?

—বাঃ খুব ভাল কথা।

ইন্দ্রানীলের খাওয়া শেষ। সে উঠতে উঠতে বলে, খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম নাও মা, পরে কথা হবে। ইন্দ্রাণীর পাতে অর্ধেক ভাত অর্ধভুক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। গলা দিয়ে নামছে না। খুব ধীরে ধীরে একটা ঠাণ্ডা সরীসৃপ তার সর্বাঙ্গ বেয়ে উঠছে আর উঠছে।

—আমরা থাকার জন্য তোমরা খুব অসুবিধের মধ্যে পড়েছ। কিন্তু কি যে করা যায়...ইন্দ্রাণীর কথা শেষ হবার আগেই তনুশ্রী যেন ঘরের দেয়ালকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠেছে, আসলে একটা এক্সট্রা ঘর, চব্বিশ ঘণ্টা জল আছে বলে আত্মীয়স্বজন সবাই ভাবে এটা হোটেলখানা। এই তো সেদিন আমার বড়দি এসে একটানা দশদিন থেকে গেল। কেন কোলকাতা শহরে কি হোটেলের অভাব? যখন যার দরকার উঠলেই হল?

—মিথ্যে কথা বলছ কেন মা? মাসি তো মোটে দেড়দিন ছিলেন।

ঝুমি কখন এ ঘরে এসেছে বোধ হয় খেয়াল করে উঠতে পারে নি তনুশ্রী। সে ঝুমির গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে বলে বড়দের মধ্যে কথা! যাও ও ঘরে।

এই আনকোরা নতুন তনুশ্রীকে চেনেন না ইন্দ্রাণী। এক্সট্রা ঘর, চব্বিশ ঘণ্টা জল, হোটেলখানা শব্দতিনটে ঘুরপাক খেতে থাকে তাঁর মাথার মধ্যে।

ঘুমন্ত অমিতাভর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পূর্ব্বস্মৃতির আলোড়নে বিদ্ধস্ত হতে থাকেন ইন্দ্রাণী। উত্তর কোলকাতার ভাড়াবাড়িতে আত্মীয়স্বজন অতিথবিথিতের বিরাম ছিল না। হাসিমুখে সব সামলেছেন তিনি। একমাত্র ছেলেকে নিয়ে তার সংসার। মাঝে মধ্যে সেসব কথা ভুলেই যেতেন।

তনুশ্রী ইন্দ্রনীল পাপলুকে নিয়ে দোকানে গেছে। পাপলুর কী সব জুতোটুতো আরও টুকিটাকি জিনিস কিনতে বেড়িয়েছে ওরা। যাবার সময় বাবার দিকে খেয়াল রাখতে বলে গেছে ইন্দ্রাণীকে।

তবু অনিশ্চয়তার দোলায় কেমন এক অসহায় বোধ জনিত ক্লান্তি এসে যায় শরীরে। চেয়ারে বসে বসেই ঝিমোতে থাকেন ইন্দ্রাণী।

—ঠামা কি করছ?

ঝুমির ডাকে চট্‌কা ভাঙ্গে। বলেন—কি হল? আয় এদিকে। গল্প শুনবি?

গল্প শোনায় ঝুমির মন নেই। তার চোখে চোরা চাউনি। বলে সে—ঠামা মা বলেছে আমাদের ভবিষ্যৎ নাকি অন্ধকার! প্রাইজ পাবার কোন আশা নেই।

সামান্য থেমে ঝুমি আবার বলে, ঠামা দাদুর অসুখে অনেক টাকা খরচ হবে না? মা ঝগড়া করাতে বাবা বলল বিপদে যখন পড়েছে তারা, খরচ না করে উপায় কি?

ঝুমির কথায় কোন নতুনত্ব নেই। ঝুমি তার ঠামা দাদুকে ভালবাসে। তাই তার শিশুমনে মা'র নিষ্ঠুর আচরণ হয়ত কোন অভিঘাত তুলেছে। মাত্র ক'ঘণ্টার অভিজ্ঞতা। পৃথিবীর রঙ দ্রুত পাল্টে যায়। শক্ত পাথর হয়ে যায় ভালমানুষ ইন্দ্রাণীর নরম মন। অন্ধকার হয়ে এসেছে। সুইচ্ অন করে আলো জ্বালেন ইন্দ্রাণী। ঝক্‌ঝকে আলোয় সাজানো ঘরে জমাটবাঁধা একরাশ কালো মেঘের স্থিরতা ইন্দ্রাণীর মনে ঝড় ওঠার চিহ্ন বলে মনে হয়। সংসারের বৃত্ত এত ছোট হয়ে গিয়েছে জানা ছিল না। সেখানে এখন চারজোড়া বা তিনজোড়া পায়ের বেশী আর এক জোড়া পায়েরও স্থান নেই।

পিয়ানো বাজার শব্দ হাওয়ায় ভাসে। ঠামার কোলঘেষা ঝুমি দ্রুত সরে যেতে যেতে বলে এইরে—বাবা মা বোধ হয় এসে গেল তুমি কিন্তু কিছু বলো না ঠামা। যাই বাবা পড়তে বসিগে।

অন্ধকারে পথ হাতড়ানোর অনুভূতি নিয়ে দরজার ছিট্‌কিনিতে হাত রাখেন ইন্দ্রাণী। প্রাণপণে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টায় পুত্র পুত্রবধূর দিকে তাকাতে গিয়ে ধাক্কা খান। কালো চৌকো মুখে সাদা হাসি এবং উচ্চকিত চিৎকারে অবাক বিস্ময়। স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া পরিমল উঠে আসে ইন্দ্রাণীর চেতনায়। পরিমল না? বলার আগেই ঠুক্ করে তার সশব্দ প্রণাম ঘটা করে।

—বৌদি? ওঃ কদিন বাদে দেখা বল তো?

অমিতাভর দূরসম্পর্কের পিতৃহীন জ্ঞাতিভাই পরিমলের বেশ ক'টা বছর কেটেছিল ইন্দ্রাণীর সংসারে। পুত্র ইন্দ্রনীলের প্রতি অমিতাভর যথেষ্ট একচোখোমি ছিল। বোধ হয় তার মেধার দরুন। সব খরচা তার মেধার কারণে পুষিয়ে যেত। পরিমল এত মাথামোটা ছিল যে ভাল স্কুল তো দূরের কথা একটা সাধারণ মাপের স্কুলে তাকে ভর্তি করতে গিয়ে অমিতাভর কালঘাম ছুটে গিয়েছিল। সে কারণেই হয়তবা ওর প্রতি অমিতাভর বিরক্তিবোধ জন্মে গিয়েছিল। ইন্দ্রাণীর ব্যবহার ছিল উল্টো। লাবণ্যহীন মেধাহীন এই গ্রাম্য অল্পবয়সী দেওরটি রবিঠাকুরের 'ছুটি' গল্পের নায়ক ফটিকের কথা মনে পড়িয়ে দিত। মনের অন্দরে অনুভূত হত এক ধরনের বেদনাবোধ। না—ছেলের পাতে বড় মাছের টুকরো দিয়ে পরিমলের পাতে ছোট সাইজের মাছ দেওয়া কিংবা আদরযত্নে তাকে বঞ্চিত করা মনের কোণেও আনা যায় নি। ইন্দ্রাণীর জেদে ওর জন্য প্রাইভেট টিউটর পর্যন্ত রাখা হয়েছিল। অমিতাভ মাঝে মাঝে বলতেন আদর দিয়ে ওর মাথাটা খাচ্ছ তুমি!

এত পয়সা খরচ করা হচ্ছে—বেকার! পড়াশোনায় এতটুকু মন নেই। বাবা নেই। কোথায় দাঁড়াবার চেষ্টা করবি তা না সুযোগ হাতের মুঠোয় তাও নেবার চেষ্টা নেই।

তিনবারের বার হায়ার সেকেন্ডারী উতরানোর পর হাত জোড় করে বলেছিল পরিমল—আমার জন্য তোমরা অনেক করেছ বৌদি। পড়াশোনা আমার হবে না। দাদাকে বলে যে কোন একটা চাকরি যোগাড় করে দিতে বলো, মা'টাকে তালে নিয়ে আসা যাবে। গ্রামের বাড়িতে খেয়ে না খেয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে তাকে। এমনিতে হাসিখুশী তাগড়াই চেহারা পরিমলের। যেচে যেচে সে অনেক ফাইফরমাশের কাজ করে দিত। হয়ত বৌদির যত্নের শোধ দিত এভাবে। ছাত্রদের কল্যাণে অমিতাভর পরিচিতির বিশাল ব্যাপ্তি। ছাত্র সমীর সাহার বাবার নানা ধরনের ব্যবসা। তাকে ধরে পরিমলের চাকরির ব্যবস্থা পাকা হয়ে গিয়েছিল। চাকরিতে জয়েন করেই সে কোন গলির ভেতর এক খুপড়ি ঘর ভাড়া করে মাকে নিয়ে এসেছিল। প্রথম প্রথম পেয়ারা বা চানাচুরের প্যাকেট হাতে আসত সে। ইন্দ্রাণীর ধমক খেতে হত। কেন এসব আনিস বলত? পয়সা কি বেশী হয়েছে?

ইন্দ্রানীলের বিদেশযাত্রা তার ফিরে আসা নামী এক্সিকিউটিভ হওয়া ধনী বংশের উচ্চশিক্ষিতা মেয়ের পাণিগ্রহণ—একটি বিশেষ উচ্চতার মাপকাঠিতে উঠে যাওয়া পরিবারে পরিমলের ছায়া ক্রমশঃ মিলিয়ে যায়। যাওয়া আসার পর্ব এক সময় স্তব্ধ হয়ে গেল। এরপর ইন্দ্রাণীরা এমন দূরে বাসা বেঁধেছে সেখানে দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার প্রশ্ন আসে না। সেই পরিমল তার সামনে দাঁড়িয়ে যার গা থেকে এখনও গ্রাম্য গন্ধ মুছে যায় নি।

—আয় আয় কত বছর বাদে দেখলাম। ভাল আছিস?

—ভালই আছি। পুরোন লড়ঝরে ঘরটা ছেড়ে দিয়েছি। দু'কামরার ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছি। পরিশ্রমেও টাকা উপার্জন হয় বৌদি।

—বাঃ, তোর মা? কেমন আছেন?

—এখনও তাঁর রেঁধে দেওয়া ভাত খেয়ে বেঁচে আছি।

—কেন বিয়ে করা হয় নি?

—পাগল নাকি? সুখশান্তি যা আছে তা বিসর্জন দেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।

করিডোর পেরিয়ে ঘরে ঢুকে খাটে শোওয়া অমিতাভকে দেখে প্রশ্ন করে পরিমল, অবেলায় ঘুমোচ্ছেন? শরীর খারাপ নাকি?

চোখে আঁচলচাপা দেওয়া ইন্দ্রাণীর ফুঁপিয়ে ওঠা কান্না পরিমলকে সচেতন করে দেয়।

—কি হয়েছে দাদার? কেঁদো না বৌদি। নার্ভাস হতে নেই।

তাঁর কাঁধে পরিমলের মোটা থাবার স্পর্শ এবং আশ্বাস ইন্দ্রাণী। চোখ মুছে তাকালেন পরিমলের দিকে।

—আমাদের খুব বিপদ পরিমল। ইন্দ্রাণীর চোখের তলায় পুরু কালি, শুকিয়ে যাওয়া মুখচ্ছবি এতক্ষণে ভাল করে নজরে আসে।

—কেন? কিসের বিপদ বৌদি?

—ওর বুকে পেস্‌মেকার বসাতে হবে। এদের বাচ্চাদের আবার পরীক্ষা সামনে। বেশ কিছুদিনের ব্যাপার। নীল হয়ত ছুটি পাবে না। এমন বিপদে পড়ব দু'দিন আগেও....।

গলার স্বর বুজে যাওয়াতে থেমে যান ইন্দ্রাণী। মোটামাথা পরিমলের কাছে কেন যেন অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়।

—কোন দরকার হলে নির্দ্বিধায় বল বৌদি—আমি আছি।

সমুদ্রে পড়ে গেলে খড়কুটো ধরে যেমন মানুষ বাঁচতে চায় অনেকটা সেই ভঙ্গীতে ইন্দ্রাণীর ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠস্বর শুনতে পায় পরিমল।

—ক'দিনের জন্য তোদের বাড়িতে আমাদের জায়গা হবে পরিমল?

—সে সৌভাগ্য কি আমার হবে বৌদি? তবে ছোট বাড়িতে তোমাদের কষ্ট না হয়। অনেক নুন খেয়েছি তোমাদের। একটু খানি শোধ করবার যদি সুযোগ দাও তো....।

সব কথা শোনবার ধৈর্য নেই ইন্দ্রাণীর। খুব দ্রুত যেন হাতের মুঠোয় পাওয়া পরিমল এক্ষুনি হারিয়ে যাবে এভাবে বলে উঠেছেন, কাল বেলা ঠিক ন'টায় ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসিস আমি তৈরি থাকব।

মনে মনে টাকার হিসেব ছকে ফেলেছেন ইন্দ্রাণী। ভরি পনেরো সোনার গয়না লকারে না রেখে বাড়িতেই রাখতেন। আসার সময় খালি বাড়িতে না রেখে নিয়ে এসেছেন সঙ্গে করে। বেচে দেবেন। কোলকাতার ব্যাঙ্কে কুড়ি হাজার টাকার ফিক্সড ডিপোজিট আছে। তুলে নেবেন। কুড়িয়ে বাড়িয়ে উঠে আসবে চিকিৎসার খরচা।

রাত্রে খেতে বসে খুব সহজ সুরে ইন্দ্রাণী বললেন, ভেবে দেখলাম এখান থেকে তোদের বাবার চিকিৎসা করাতে আমার খুব অসুবিধে হবে। পি জি হস্‌পিট্যালের দূরত্ব অনেকটা। পরিমলের বাড়িতে আপাততঃ উঠব, তারপর কি করা যায় দেখব।

—কী বলছ মা! আমরা থাকতে পরিমলের বাড়িতে থাকবে তুমি?

তনুশ্রী বলে, আঃ বাধা দিচ্ছ কেন? ঠিক কথাই বলেছেন মা। পরিমলদা তো আবার ঝাড়া হাত পা।

—কিন্তু টাকা? কোথায় পাবে?

আশ্চর্য দৃঢ়তায় ইন্দ্রাণীর জবাব আসে, যোগাড় হয়ে গেছে। খাওয়ার আসর নিঃশব্দ। এমন কি বরাবরের অভ্যাসমত তনুশ্রীর মুখে ঝুমি পাপলুর প্রশংসাধ্বনি নির্গত হয় না।

পরদিন সকাল ঠিক ন'টায় পরিমল ট্যাক্সি নিয়ে হাজির। ওর আসার আগেই যা গোছাবার গুছিয়ে নিয়েছেন ইন্দ্রাণী। সবকিছু খোলবার অবকাশই হয় নি। শুধু অস্বচ্ছ অমিতাভর সন্দেহজনক বোবা দৃষ্টি ইন্দ্রাণীর মনের শান্তিকে ব্যাহত করে চলেছে। ইন্দ্র দেরী করে অফিস যাবে। পাংশুটে মুখ নিয়ে তাকে এঘর ওঘর করতে দেখা যাচ্ছে। ম্যাক্সিপরা তনুশ্রীর তীক্ষ্ণ চোখ, দীর্ঘদিনের নিখুঁত অভিনয় সমৃদ্ধ মুখের দিকে তাকাতে ইন্দ্রাণীর ঘৃণা বোধ হয়।

বাইরের দরজায় চোখ রাখা ইন্দ্রাণীর মুখ থেকে সম্বোধনহীন, যাই তাহলে, শব্দ দুটি শোনা যায়।

—দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে গেলেই পারতেন, আসলে সামনেই ওদের ফাইনাল পরীক্ষা, ওর কাজের চাপ....।

অমিতাভকে আগেই বসানো হয়েছে ট্যাক্সিতে। মাথা নিচু করে নিজেকে ট্যাক্সির ভেতর চালান দিতে দিতে বলে ওঠেন ইন্দ্রাণী, অসুবিধা হচ্ছে বলেই তো যাচ্ছি।

ইন্দ্র এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। ট্যাক্সির দরজা বন্ধ হবার মুহূর্তে আচমকা ইন্দ্রর চিৎকার শোনা যায়, মা তোমরা যাবে না।

মাত্র ক'টি মুহূর্ত। অনেকদিন আগের অল্পবয়সী নীলের 'মা' ডাক বুক এফোঁড় ওঁফোড় করে বেড়িয়ে যায়। স্থায়ী হয় না। তাই নরম হয়ে আসা ইন্দ্রাণী ফের কঠিন পাথর। ট্যাক্সির পাঞ্জাবী চালকের উদ্দেশ্যে বলে ওঠেন, চলিয়ে ড্রাইভারজী জলদি।

হারজিৎ

শূন্যে পাঁচটা আঙ্গুল তুলে বিশাখা বলল—ভুলে যাস না তুই মেয়ের মা। কাগজপত্তরে যত কিছু লেখা হোক না কেন মেয়ে যত গুণেরই হোক না কেন আগের সেই ট্র্যাডিশন এখনও বজায় আছে। মেয়েপক্ষ হলে হাতজোড় করে থাকাটাই নিয়ম।

বিশাখা চায়ের কাপ হাতে ড্রইং রুমের সোফায় বসে। ড্রইং ডাইনিংরুমের মাঝে পর্দার আড়াল নেই তাই খাবার টেবিল দৃশ্য। জলখাবারের কাপপ্লেট গোছাতে ব্যস্ত অহনার দিকে ওর মাসতুতো বোন বিশাখা কথাগুলো ছুঁড়ে মারল। কাজে ব্যস্ত অহনা চোখ তুলে তাকাল বিশাখার দিকে। উত্তর দিল না। আজ অহনার মেয়ে তুপাকে পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে। সম্বন্ধটা বিশাখা দিয়েছে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে। পাত্র চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট।

টেবিলের ওপর বড় বড় সাইজের চার পাঁচরকমের মিষ্টি আপ্যায়নের অপেক্ষায়। নোনতার মধ্যে আলুর দম আর কচুরির বন্দোবস্ত করা হয়েছে। রান্নাঘরে মঙ্গলা ময়দা ঠাসছে। কিছুক্ষণ আগে এদিকের খানিকটা কাজ এগিয়ে দিয়ে গেছে বিশাখা। ফার্স্ট রাউন্ডের চারকাপ চা সেই তৈরি করেছে। অহনার ছোটবোন সুজাতা শোবার ঘরে তুপাকে নিয়ে ব্যস্ত। বিশাখার স্বামী অ্যাডভোকেট দেবাশিস মিত্র চা'পানে মনসংযোগ করেছে। সোফার পাশে সাইড টেবিলে রাখা একগুচ্ছ রজনীগন্ধার সৌরভ এখান থেকেই টের পেল অহনা। আজ সকালে রজনীগন্ধার স্টিকগুলো পড়িমরি করে কিনে এনেছে সে।

জ্বলন্ত সিগারেটের ছাই সামনের অ্যাসট্রেতে ঝাড়তে ঝাড়তে দেবাশিস বলল—লাভম্যারেজ তো ল্যাঠা চুকে গেল। সম্বন্ধ করে বিয়ে দেওয়া মানে পটভূমি সেই পঞ্চাশ বছর আগের। তবে হ্যাঁ—সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ফের বলে উঠল—কিছুটা পরিবর্তন তো এসেইছে। আগের দিনের চাহিদা ছিল ছোটখাটো লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত কাজকর্মে পটু ঘরোয়া মেয়ের। এখন স্ট্র্যাটিজিটা পাল্টেছে অর্থাৎ চাহিদার মাত্রা বেড়েছে। লম্বা, ফর্সা, সুন্দরী, কনভেন্ট এডুকেটেড মেয়ে চাই। পার্টি ফার্টি অ্যাটেনড করবার মত স্মার্ট অথচ ওল্ড ভ্যালুজে বিশ্বাসী হওয়া চাই। মেয়ের বাবা কতটা ধনী সেটাও বিচার্য। হরেক বাহানা হুঃ।

আচমকা চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে সোচ্চারে বলে ওঠে অহনা—আমার কিন্তু দারুন ভয় লাগছে।

বিশাখার সশব্দ হাসিতে ঘর ভরে যায়। হাসি থামিয়ে সে বলে—আমার কন্যাটির রঙ কিঞ্চিৎ চাপা ছিল বলে বছর চারেকের চেষ্টায় একটিকে জালে তুলতে পারা গেছে। যা সব গল্প আছে না ঝুলিতে। অনেক কিছু দেখতে হবে। সিঁথিতে সিন্দুর উঠলে বুঝবি ভবসমুদ্র পার হলি।

সিগারেটের শেষাংশ অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিয়ে দেবাশিস বলল—অবশ্য তুপা ওর রঙের জন্য বেরিয়ে যাবে। ধর গিয়ে রঙের কারণে একশ'র মধ্যে ষাট পেয়ে বসে আছে বাদবাকি....

অহনার হাত থেকে প্লেট পড়ে যাওয়াতে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ ওঠে। দেবাশিস তার কথা কমপ্লিট করতে পারে না। নার্ভাসনেসে কাহিল অহনাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। স্বামীর অকালমৃত্যুর পর থেকে ও কেমন যেন হয়ে গেছে। তার ওপর একমাত্র ছেলে আমেরিকায় পড়তে গিয়ে লিন্ডা নামে এক আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করে বসে আছে। সেই থেকে নার্ভাসনেস যেন হু হু করে বেড়ে চলেছে।

দেবাশিস কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে নিয়ে বলল—চারটে বাজে। ওদের কিন্তু আসবার সময় হয়েগেছে। এসময় ফ্ল্যাটের সামনে কোন গাড়ি এলে দারোয়ানকে খেয়াল করতে বলা হয়েছে। মঙ্গলাকে নিচে পাঠিয়েছে অহনা।

তুপাকে নিয়ে ঘরে ঢুকেছে সুজাতা। তুপার গলায় সরু চেন হার হাতে চুড় কানে লাল পাথর বসানো ছোট্ট ফুল। পরনে জংলা প্রিন্টের শাড়ি। ক্রীম ছাড়া মুখে কিছু মাখানো যায় নি। দরকারও নেই। ওর মুখ এমনিতেই চক্‌চকে। অহনার চোখের পাতা পড়ে না। দেবাশিস বিশাখার মুগ্ধ দৃষ্টি দেখল অহনা। দেবাশিস কি একটা বলতে যায়। মঙ্গলার কিন্‌কিনে চিৎকারে দেবাশিসের মন্তব্য চাপা পড়ে যায়। উত্তেজিত মঙ্গলা 'এসে গিচে' 'এসে গিচে' বলে খোলা দরজা দিয়ে কিচেনে ঢুকে যায়। তুপা অদৃশ্য। তিনজনের মুখমণ্ডলে মন্ত্রীআগমনে স্তাবকদের মুখের মত বিনয়বিগলিত ভাব। সামান্য সময়। মিস্টার জিৎ দত্ত ও তার স্ত্রী দরজায় ছবি।

—নমস্কার। আসুন আসুন। (সমবেত কণ্ঠ)

—বসুন। (অহনার গলা)

আসন গ্রহণের পূর্বে জিৎ দত্তর ভারী গলার নমস্কার ধ্বনি শোনা যায়। তার মোটাসোটা স্ত্রী নীরবে হাতজোড় করে ভদ্রতা জানায়। দত্তের মুখে দীপ্ত অহঙ্কারের আবরণ সবাইকে কিছুক্ষণের জন্য সম্মোহিত করে রাখে। কাশ্মীরি কাজকরা সাইড টেবিলে ফুলতোলা ফুলদানীর একগুচ্ছ রজনীগন্ধার সৌরভে জিৎ দত্ত মন দিয়েছে কি না ঠিক বোঝা গেল না। তবে অহনা দেখল দত্তর অনুসন্ধানী চোখ ঘরের

প্রত্যেকটি প্রাণী এবং আসবাবপত্রের ওপর ফোকাস ফেলছে। পাত্রীপক্ষের স্বচ্ছলতা কোন পর্যায়ের বোঝার জন্য কি? ঘরের একমাত্র পুরুষ সভ্যের ওপর তার দৃষ্টি স্থির হল। —আপনি?

—পাত্রীর মেসো।

—কোথায় থাকা হয়?

—আজ্ঞে সল্ট লেক।

—কি করা হয়?

—অ্যাডভোকেট। প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ করি।

—আপনি?

—মাল্টিন্যাশনাল ব্রিটিশ কম্পানির জেনারেল ম্যানেজার ছিলাম। রিটায়ারের পর কনসালটেন্‌সি করি।

—আপনার ছেলে?

সগৌরব হাসিতে দত্তর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে দেখল সবাই।

—আমার ছেলে মশায় প্রচণ্ড ব্রিলিয়ান্ট। চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট। দারুন হ্যান্ডসাম। ছ'ফুট লম্বা....দারুন....

—ছেলের নাম? কোথায় আছে এখন?

প্রচণ্ড রেগে ওঠে দত্ত। বেশ ধম্‌কানোর সুরে বলে, —বলব না।

যথেষ্ট নরম গলা দেবাশিসের,—আজ্ঞে কোন বাধা আছে নাকি?

—আলবৎ। মেয়ের মা বাবাদের যা উৎপাত! চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে মশায়। আমার পুত্র পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে তার নাম অফিসের ঠিকানা যেন কাউকে না দেওয়া হয়। কী বলব মশায় অফিসের কেরানিদের কাছে পর্যন্ত এনকোয়ারি চালাচ্ছে পাত্রপাত্রীর মা-বাবারা!

অভিজ্ঞ বিশাখা এতক্ষণে কিছু বলবার স্কোপ পায়।—তা দাদা রূপগুণান্বিত পুত্র থাকলে পাত্রীপক্ষের অমন একটু আধটু উৎপাত সহ্য করতেই হয়।

—ও হ্যাঁ—কবে রিটায়ার করেছেন?

দেবাশিস ওর স্ত্রীর তেলানো কথা থামিয়ে দেয়।

—গতবছর। কিন্তু এখনও আমি যথেষ্ট কর্মক্ষম।

—বাঃ, বসে পড়লে জীবনও বসে যায়। তাই না? সোনার জলে কাজকরা সিগারেট কেস দত্তর হাতে। ঠোঁটে সিগারেট গোঁজা অবস্থাতেই বলে—গতবছর যখন আমেরিকায় গিয়েছিলাম...তখন...চোখ কুঁচকে লাইটার জ্বেলে অগ্নিসংযোগে ব্যস্ত হওয়ার দরুন কথা থম্‌কে যায়।

—বাঃ আমেরিকায়? কাজে?

—আরে না মশায়! যখন কাজে যেতাম ঘুরিনি নাকি? এবার স্ত্রীপুত্র নিয়ে নিছক বেড়াতে গিয়েছিলাম।

—বাঃ তা ঘুরলেন কেমন?

বাঃ শব্দটি বারংবার ব্যবহারে বিশাখা স্বামীর দিকে দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করে। মনে ভাবে বয়স ষাট ছুঁতে যাবে চ্যাংড়ামোতে ওস্তাদ।

—দারুণ ঘুরলাম। তবে বিদেশে পার্মানেন্ট থাকাটা আমার পছন্দ নয়। তা আপনার ছেলে আমেরিকা থেকে ফিরবে কবে?

অহনা চম্‌কায়। বিশাখার বুদ্ধিতে রুন্টুর বিয়ের খবর চেপে চিঠি লিখেছিল। খেই ধরতে ওস্তাদ বিশাখার চট্‌পট্‌ জবাব—দাঁড়ান পড়াশোনা আগে শেষ হোক—তবে তো ফিরবে।

—কিন্তু আপনি যা লিখেছেন—অহনার দিকে তাকালো ভদ্রলোক—তাতে হিসেবমত তার এবছরই ফিরে আসা উচিৎ।

বিশাখা ফের খেই ধরে—কিন্তু চাকরিবাকরি না পাওয়া পর্যন্ত ফেরার নিশ্চয়তা কোথায়? ডক্টরেট ডিগ্রীধারীদের এখানে কি তেমন নিশ্চয়তা আছে?

অহনা দ্রুত উঠে যায়। আশ্রয় নেয় রান্নাঘরে। ভদ্রলোকের কথাবার্তার ধরনে সুজাতা মুখের বিরক্তভাব গোপন করে না। বিশাখা তৎক্ষণাৎ সুজাতার পরিচয় প্রদানে ব্যাগ্র হয়। ওকে দেখিয়ে বলে—মেয়ের মাসী, কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ার, এম টেক্‌।

দেবাশিস হামলে পরে সুজাতার ডেজিগনেশন, কম্পানির নাম বাৎলে দেয়।

—কেরিয়ারিস্ট মেয়ে আমি একদম পছন্দ করি না। বাড়ির কর্তা অফিসফেরৎ এক কাপ চা যদি না পায়....

—দাদা ঠিকই বলেছেন। চাকরি করলে সংসারে খানিকটা বিশৃঙ্খলা আসেই। আলোচনার বাঁকাপথ সোজা করতে অক্ষম হয় বিশাখা। সুজাতার মুখ লাল। হুল ফোটালে মুখ খোলা তার স্বভাব। সুজাতা, জিৎ দত্ত এবং দেবাশিসের মধ্যে প্রচণ্ড বিতর্ক শুরু হয়। অন্য কেউ এখন উপস্থিত হলে বুঝতেই পারবেন না এখানে মেয়ে দেখার ব্যাপার আছে। বেগতিক বিশাখা উঠে পড়ে। বিতর্কের মাঝেই চায়ের ট্রে হাতে তুপার প্রবেশ। দু'পাশে মা আর মাসী। মিস্টার দত্ত স্তব্ধ। হাঁ করে তাকিয়ে আছে তুপার দিকে। অনেক ঘাটের জল খাওয়া লোক। চিঠির বর্ণনার সঙ্গে পাত্রীর এমন হুবহু মিল আর কোথাও দেখেন নি।

—বোস বোস। নাম কি তোমার?

নাম বলে তুপা চায়ের কাপ দিতে যায়। এগিয়ে দেওয়া হাত সরিয়ে নিয়ে দত্ত বলে—চায়ে নিশ্চয় চিনি দিয়েছ। হাইসুগার। চিনি বারণ।

—ঠিক আছে। আমি এক্ষুনি চিনিছাড়া চা করে আনছি।

মেয়েটির মিষ্টি কণ্ঠস্বর এবং সৌজন্যবোধ মুগ্ধ করে ফেলল দত্তকে। অঙ্ক মিলে যাচ্ছে। হাল্‌কা খুশী উছলে ওঠে মনে। জলখাবারের প্রাচুর্য দেখে—হেঁ হেঁ, একি করেছেন—বললেও তার সম্মানার্থে এ আয়োজন তাকে স্ফীত করে তুলল।

তুপার ইন্টারভিউ শুরু হয়েছে।

—রান্নায় ইন্টারেস্ট আছে?

মাথা হেলাতেই দত্তর প্রশ্ন ছুটে আসে।

—কি কি জান?

—ডাল, ভাত, তরকারি, চপ....

—অঃ ইংরেজীতে কথা বলতে পার?

দেবাশিষ ফুঁসে উঠে কিছু বলতে যায়। বিশাখার গোপন চিমটি তাকে নিরস্ত করে। ভদ্রলোক কি জানে না ইংলিশে অনার্স ছিল তুপার? সে এম এ ক্লাসের ছাত্রী?

—মিশনারী স্কুলে পড়েছি। ইংরেজী বলতে পারব না?

—তা ঠিক। গল্পের বই ভালবাস? কি কি বই পড়েছ?

—অলিভার ট্যুইস্ট, নিকোলাস নিকোলবি, এ টেল অব টু সিটিজ এছাড়া আলফ্রেড, হিচ্‌কক, জেমস বন্ড, লরেন্স স্যান্ডারসন, জেন অস্টিন, চার্লস ডিকেন্স....

—বাঃ। ছেদ টানেন দত্ত।

অকপটে মনের কথা বলে দত্ত—আপনার মেয়েকে আমার দারুন লাগল। আসলে যে যে পয়েন্টগুলো ভেবে এসেছিলাম সবকটিই মিলে গেছে।

সামান্য বিরতি। তারপর বলে—একদিন চলুন সবাই আমার বাড়ি দেখে আসবেন। ফ্ল্যাট নয়। সোয়াকাঠা জমির ওপর এন্টালিতে বাড়ি।

দেবাশিস বলে—আরে বাবাঃ কোলকাতা শহরে জমির ওপর বাড়ি ?

—নিজে দাঁড়িয়ে বাড়ি তৈরি করেছি মশায়। নিচে ড্রইং কাম ডাইনিং কিচেন—দোতলা আমাদের—তেতলা ছেলের।

ঘরের ভেতর অন্ধকারের অস্বচ্ছ পর্দা। সূর্য কখন পাটে নেমেছে বোঝা যায় নি। অহনা উঠে গিয়ে সুইচ অন করে আলো জ্বালল। ঝলমলে আলোয় ঘর ভরে যায়।

দত্ত বলে—আপনাদের ছেলেকে খবর দিন। কবে নাগাদ সে ফিরবে জেনে নিন। মেয়ের বিয়ে হলে একা একা থাকবেন কি ভাবে?

বিশাখা ম্যানেজ দেবার আগেই সবাইকে চম্‌কে দিয়ে অহনা বলে উঠল—তার এদেশে ফেরবার সম্ভাবনা নেই মিস্টার দত্ত। সে একটি আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করেছে। সুতরাং এদেশে...বুঝতেই পারছেন।

দত্তর ফোলা মুখ চুপ্‌সে যায়। —তাহলে তো ভারী সমস্যা। একা থাকবেন কি ভাবে?

বিশাখাতৎপর—কেন অসুবিধে কিসের? আমরা আছি আরও পাঁচজন আত্মীয়স্বজন আছে।

—তা অবশ্য ঠিক। বলে তুপার দিকে তার হাসিমুখ—

—কি মা দুনৌকোয় পা দিয়ে চলতে পারবে? না মা'র দিকে বেশী ঝোঁক দেবে?

তার আপন করা কথায় সবার মুখ থেকে চাপা টেনশনের ছায়া সরে যেতে দেখল সুজাতা।

—আজ তাহলে চলি। যাবেন আপনারা। আপনাদের আন্তরিক ব্যবহারের জন্য ধন্যবাদ।

দত্তর পরে পুত্তুলিকাবৎ মিসেস দত্তর মুখ থেকে এতক্ষণে শব্দ বেবোয়—আপনারা যাবেন কিন্তু।

বিদায়পর্বে রাস্তায় সার দিয়ে দাঁড়িয়ে অহনা, দেবাশিস, বিশাখা। সুজাতা নামে নি। ঝাঁ চক্‌চকে ফিয়াট গাড়ির ভেতর থেকে মুখ বার করে দত্ত বলল—মেয়ের একখানা ফটো নিয়ে যাবেন। ছেলেকে দেখাতে হবে তো?

আলোচনাপর্বে বিশাখা বলল—ভদ্রলোক একটু পায়াভারী। তা হোকগে। গাড়ি বাড়ি একমাত্র সুদর্শন শিক্ষিত ছেলে। আর কি চাই?

দেবাশিস বলল—তুপাকে সেন্ট পার্সেন্ট পছন্দ হয়েছে। একমাত্র সুজাতা বলল—বাজে লোক। এগোস না।

দিন পনেরো বাদে জিৎ দত্তের বাড়ি গেল দেবাশিস অহনা। বিশাখার শরীর পারমিট না করাতে সে আসেনি। মিসেস দত্ত দরজা খুলে দিয়েছে। ওদের বসতে বলে কাঁচুমাঁচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

দেবাশিস বলল—মিস্টার দত্ত বাড়ি নেই?

—আছেন। ওপরের ঘরে টিভিতে বাজেট দেখছে।

—ডাকুন তাকে।

—আচ্ছা।

ভদ্রমহিলা বেরিয়ে যেতে দেবাশিস বলে—ভাবগতিক সুবিধের নয়।

খানিক বাদে ঘরে ঢুকে দত্ত বলে—অঃ, আপনারা এসে গেছেন।

—আজ্ঞে সেরকম কথাই তো ছিল—বিগলিত উত্তর দেবাশিসের।

অহনা তুপার ফটো বার করে মহিলার হাতে দিতেই সে অদৃশ্য হয়।

দত্তর কথার তোড়ে বাইরের ঘরখানা গম্‌গম্ করছে। আলোচনার বিষয়বস্তু—ভারতসরকার। দেওয়ালের রঙ, সাইড টেবিলের কারুকার্য, পর্দার নক্সা, কার্পেটে

ফুলের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে অহনার খেয়ালে এল দত্তর খেজুরে আলাপের খচ্‌খচি শেষ হচ্ছে না।

—আরে মশায় আজকাল যারা রাজনীতি করে মাথার ঘিলু বলে তাদের কোন পদার্থ আছে নাকি? একজনের নাম করুন তো মশায় যে বিচক্ষণ আর সৎ, সবকটা চোর বাটপার। সে ছিল আমাদের যুগ—কী সব নেতা! নেহেরু, শাস্ত্রীজী, ধরেন কি না সর্দার প্যাটেল, শ্যামাপ্রসাদ....

অন্যসময় হলে ভদ্রলোকের সত্যিকথায় অংশগ্রহণ করা যেত। কিন্তু বিয়ের কথাবার্তার জন্য ডেকে এনে রাজনীতি চর্চা প্রচণ্ড অস্বস্তির অনুভব এনে দিচ্ছে। অ্যাডভোকেট দেবাশিস কাত। সে সায় দিচ্ছে মাথা দোলাচ্ছে।

ট্রে ভর্তি খাবার হাতে কাজের মেয়ে ঘরে ঢোকে। সঙ্গে মিসেস দত্ত। সামান্য অন্যধরনের খাবার। সন্দেশ, পেস্ট্রি হটডগ।

—খান মিসেস সিন্‌হা। এসব উনি এনেছেন কোলকাতা ক্লাব (ক্যালকাটা) থেকে। বলে মিসেস দত্ত।

—মিসেস সিন্‌হা আপনাকে একটা কথা বলার আছে।

চায়ের কাপ হাতে অহনার মাথা ঘোরে জিৎ দত্তের দিকে। বলুন।

—ছেলেকে যে ভাবে হোক আমেরিকা থেকে ফিরিয়ে আনুন—এখন এইটিই আপনার প্রধান কাজ।

—আজ্ঞে কিভাবে ওকে ফিরিয়ে আনবে আপনি যদি একটু বাতলে দ্যান দাদা।

দেবাশিসের ঠাট্টার সুর ধরতে পারে না দত্ত। এক ঝট্‌কায় উঠে যেতে ইচ্ছে করে অহনার। কিন্তু যেমন শান্তমনে হটডগ চিবোচ্ছে দেবাশিস ওঠা সম্ভব হয় না।

সিগারেটের ধোঁয়া দত্তর মুখ ঘিরে। দত্ত বলতে থাকে—মশায় জীবনে কোনদিন হারিনি। এই যে দেখছেন গাড়ি বাড়ি মাল্টিন্যাশনাল কম্পানির টপ্ পজিশনে ওঠা এসবই আমার একার কৃতিত্ব। ছেলের বিয়েতেও হারতে চাই না।

হারিয়ে ফেলা উৎসাহ একলাফে দেবাশিসের চোখে মুখে।

—জীবন আমার ধন্য মিস্টার দত্ত। নামের সঙ্গে আপনার জীবনের মস্ত মিল। জিৎ দত্ত জিতেই চলেছেন হা হা...দেবাশিসের ওপর বিশ্বাস রাখা যাচ্ছে না। অহনা উঠে দাঁড়িয়ে বলে—চলি মিস্টার দত্ত।

—আসুন। এ সময় টেবিলের ওপর অবহেলাভরে তুপাকে পড়ে থাকতে দেখে ছবিটা ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল অহনা।

বাড়ির নিকটবর্তী পার্কে প্রাতঃভ্রমণ সেরে নামী কম্পানির রিটায়ার্ড সেক্রেটারি তাপস রায় বেশ দ্রুত ফুটপাত ধরে হেঁটে আসছিল। গাড়ি দাঁড় করিয়ে পানগুমটিতে সিগারেট কিনতে গিয়ে বন্ধুকে দেখতে পেল জিৎ দত্ত। তা প্রায়

দেড়বছর বাদ দেখা। রায় অবাক!—কোথায় ছিলে তুমি? বাড়ি তালাবন্ধ। ফোন কেউ রিসিভ করছে না। ব্যাপার কি?

সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে দত্ত বলল—আরে আমারো তো সেই একই কমপ্লেন। তোমরা নাকি নতুন বাড়ি করে চলে গিয়েছ?

—বছরখানেক আগে তুমিই বা ছিলে কোথায়? সামান্য চিন্তা করে জিৎ দত্ত বলল—কর্তাগিন্নী দক্ষিণে ঘুরতে গিয়েছিলাম। শরীর ভাল ছিল না। ভাবলাম চেঞ্জে গেলে হয়ত উপকার হবে।

তাপস রায় দেখলেন চিরকালের ডাটিয়াল টানটান জিৎ দত্তর শরীরে ভাটার টান। কপালে প্রচুর বলিরেখা। চেহারা ঈষৎ ঝোঁকা।

—ভীষণ রোগা দেখাচ্ছে তোমায়।

—তা ভায়া বয়স তো হল।

জিৎ দত্তের সর্বগুণান্বিত ছেলের প্রসঙ্গে এবং তার জন্য হন্যে হয়ে মেয়ে খোঁজার ব্যাপারে একসময় তার বন্ধুরা যথেষ্ট হাসাহাসি করেছে। মনে পড়তেই তাপস রায় জিজ্ঞেস করল,—তোমার পুত্রের বিয়ে থা হয়ে গেল নাকি?

—হ্যাঁ। মাসছয় আগে। সেসময় নেমন্তন্ন করতে এসে দেখি তুমি হাওয়া।

রায় শব্দ করে হেসে উঠল—দুজন দুজনকে প্রয়োজনে খুঁজে পাই নি। তা তোমার বৌমাকে দেখতে যাব একদিন।

দত্ত সে কথার জবাব না দিয়ে বলল—দেখেছ কেমন রোদ উঠেছে। কাঁচের মত বিঁধছে।

—বাড়ির কাছেই যখন এসেছ চা না খাইয়ে ছাড়ছি না, বলে তাপস রায়।

—চল তোমার নতুন বাড়িটা এ সুযোগে দেখা হয়ে যাবে।

অত্যাধুনিক অ্যাশকালার রঙের দোতলা বাড়িটির সামনে যখন গাড়ি থামাতে বললেন রায়, দত্ত আশ্চর্য বোধ করল। সেই সঙ্গে মৃদু জ্বলুনির অনুভব। সোয়া কাঠা জমির ওপর হলদে রঙের বাড়ি সরু হয়ে দুলতে থাকে চোখের সামনে। দোতলার বিশাল ড্রইংরুমে পৌঁছে রায় হাঁক ছাড়লেন—অনু দেখে যাও কাকে ধরে এনেছি।

একটি সাদা ঝুপঝুপে লোমওয়ালা স্পিৎজস্ রায়ের পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছে। আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে এসে অনুপমা বাইরের ঘরে ঢুকে অবাক।

—অ্যাদ্দিনবাদে! কোথায় ডুব মেরেছিলেন?

এই মুহূর্তে অনুপমার তেলচক্চকে স্বাস্থ্যশ্রী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে দত্ত। শেষ যেবার দেখা হয়েছিল ভেবেছিল দত্ত, জোড় ভাঙ্গল বলে। শুকনো কাঠ। ডাক্তার নাকি বলেছিল রোগটা মানসিক। স্বামী অফিসে। একমাত্র পুত্র প্রবাসে। রায়ের এ ডাক্তার ও ডাক্তার ছোটাছুটির পর্ব পরিষ্কার মনে পড়ল দত্তর।

—বয়সটা দশবছর কমিয়ে ফেলেছেন দেখছি।

হাসল অনুপমা—আপনাদের শুভেচ্ছা আর মামণির পরিচর্যা।

—মানে? আপনাদের মেয়ে আছে বলে তো জানি না।

তাপস রায় তড়বড়িয়ে বলে ওঠে, ছিল না, ঠিক কথা। বছর খানেক আগে পেয়েছি।

—কিছু বুঝতে পারছি না।

—আরে ভায়া সারপ্রাইজ দেব বলেই তো ধরে এনেছি। তাপস রায় চেঁচিয়ে বলেন—মামণি কি করছ? এদিকে এস। আমার বন্ধু এসেছেন।

পর্দা নড়ে। রিনরিনে মিষ্টি স্বরে—যাচ্ছি বাবা—বলে অল্পবয়সী বৌটি ঘরে ঢোকে।

—অরুণের বৌ। আমাদের মামণি। বম্বের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে অরুণ। এখানেই চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেনসির ফার্ম খুলেছে।

পরনে লালপাড় হাল্‌কা গোলাপি রঙের শাড়ি। লাল ব্লাউজ। কপালে ঝক্‌ঝকে লাল টিপ। ঘর আলো করে দাঁড়িয়েছে তাপস রায়ের পুত্রবধূ। দত্ত বিমূঢ়। চোখে পলক পড়ে না। অরুণের বৌ একদৃষ্টে তাকিয়ে দত্তের দিকে। ওর তাকানোর ভেতর অনেক না বলা কথা শোনা যাচ্ছে বলে মনে হল দত্তর।

পায়ে হাত দিয়ে তিনজনকে প্রণাম করে অরুণের বৌ। 'এক্ষুনি আসছি' বলে ভেতরে চলে যায়।

দত্তর চোখে ঘোর। বৌ তো নয় তাজা গোলাপফুল যেন। ঘোরের ভেতর অনেকগুলো ছবি ভেসে আসছে। মোছা যাচ্ছে না। অতি সাধারণ দেখতে মেয়েটি প্রথম থেকেই ফটফট্ ইংরেজী বলছিল। মোরামবিছানো পথ, বিশাল বাগনবাড়ি, এয়ার কন্ডিশনড্ গাড়ি এগুলো দত্তকে মোহিত করে নি বললে ভুল বলা হবে। বিয়ের কথা, মেয়ে দেখতে গিয়েই পাকা হয়ে গিয়েছিল। অষ্টমঙ্গলার মধ্যেই তনিমা বয়কাট করে বাড়িতে ঢুকেছিল। পায়ে হিলতোলা জুতো, মিনিস্কার্ট পরা পুত্রবধূর খট্‌মট্ হাঁটার শব্দ কানে ধাক্কা মারছে। শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে স্বামীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছে সে—সি ইজ টোটালি আনপঢ় গাওয়াড়। এমন কিছু বয়স নয় মেয়েটার। অথচ চিরকালের ডাটিয়াল দত্তর ডাঁট সে কোন পদ্ধতিতে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিল ঠিক বোঝা গেল না। দত্তর অতুলনীয় পুত্রকে বগলদাবা করে তনিমা এখন তার বাবার কিনে দেওয়া ফ্ল্যাটে সংসার পেতেছে। মাঝে মধ্যে ফোনে তার 'হাই' 'হ্যালো' শব্দ ভেসে আসে।

এসব ছবি অবলোকন করতে করতে তাপস রায় এবং তস্য গিন্নীর পুত্রবধূ সম্পর্কিত পঞ্চমুখ প্রশংসা ব্যাক্‌গ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে ঠিক স্যুটেবল মনে

হচ্ছিল না। বরঞ্চ একধরনের অগ্নি দহনে অস্থির হতে হচ্ছিল। বাধা দেওয়া যাচ্ছে না তাপস রায়ের সোচ্চার গল্পকে। তার হাহা হাসির শব্দ যেন চাবুকের বাড়ি।

অরুণের বৌ ট্রে হাতে ঘরে ঢোকে। দত্তের দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে গিয়ে শ্বশুরের সাবধানবাণী কানে আসে,—এহে, মামণি ওর তো হাই সুগার, চিনি দেওয়া চা ও খায় না।

—জানি বাবা। ওনার জন্য চিনিছাড়া চা আর স্যাকারিন দেওয়া সন্দেশ নিয়ে এসেছি।

কর্তাগিন্নী প্রায় একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছে—তুমি কি করে জানলে? তুপার মুখে মিচ্‌কি হাসি ঢেউ তুলে মিলিয়ে যায়। দু'চোখ ঝিক্‌মিকিয়ে ওঠে—সে কথা ওনাকেই জিজ্ঞেস করুন।

অবসন্ন প্রায় ভেঙ্গেপড়া দত্তসাহেব গাড়ির পেছনের সিটে হেলান দিয়ে বসে আছে। চুপচাপ। অন্যসময় ড্রাইভারের সঙ্গে টুকরো টাক্‌রা কথা বলে নিঃসঙ্গতা দূর করবার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে। আজ বড়ই নিস্তেজ। মন তার কিসের কারণে ভারাক্রান্ত তা দত্ত ছাড়া এ পৃথিবীর আর কেউ কি জানে? এতবড় পরাজয় তার জীবনে কি আর কখনো হয়েছে? মনে হতে লাগল দত্তর সবথেকে বড় অঙ্কটার হিসেবে বড় বেশীরকম ভুল হয়ে গেছে।

উত্তরণ

পশ্চিমের জানলা দিয়ে মহিলাকে দেখা গেল। কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ। চেনা দৃশ্য। সামান্য শ্লথ কিন্তু নিশ্চিন্ত পদক্ষেপ। সুনেত্রা জানে আসছে সে নির্ধারিত ঠিকানায়। বিকেলের টুকিটাকি কাজ সেরে জানলায় দাঁড়িয়েছিল। হয়ত আকাশ দেখার লোভে। কারণ ঘিঞ্জি বাড়ির ফাঁকফোকর গলেও এ জানলা দিয়ে কিছুটা আকাশ দেখা যায়। আজ বর্ষাবিধৌত আকাশের গায়ে বিচিত্রবর্ণ আলপনা। মুগ্ধতা আসতে না আসতেই মহিলাকে চোখে পড়ল। একরাশ বিরক্তি মনটাকে অমনি ভাবী করে তুলল। চোখ সবিয়ে নিয়ে দেয়াল ঘড়িতে সময় দেখল। দিনশেষেব হালকা আলো ঘরের ভেতর। আর একটু বাদেই পামিকে নিয়ে শেফালি ফিরবে। খানিকটা খেলামেলা হাওয়া পাবার আশায় ধুলোওড়া সামনের পার্কটাতে মেয়েকে শেফালির সঙ্গে পাঠিয়ে দেয় সুনেত্রা। শেফালি সুন্দরবনেব প্রোডাক্ট। বয়স বেশী নয়। আজকাল বনে জঙ্গলে কাঠমধু সংগ্রহ করে আর মাছ ধরে ওসব অঞ্চলের মানুষদের আব পেট ভরছে না। ওরা তাই কোলকাতার মানুষের জঙ্গলে বাসনমাজা কাপড়কাচার কারখানায় সুযোগ পেলেই ঢুকে যাচ্ছে। এসব তথ্য সুনেত্রা শেফালির কাছেই জানতে পেরেছে। তা এই শেফালিকে দিনরাতের জন্য রাখতে গিয়ে কম ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়তে হয় নি। ব্যাগ কাঁধে মহিলা মানে সৌম্যর মা দারুন বেঁকে বসেছিল। বলেছিল এই তো এক ফালি ঘর তার মধ্যে দিনরাতের লোক। কত টাকা খরচ হবে তা জানিস সৌম্য? কত টাকা মাইনে পাস? কেন ঠিকে লোকেই তো বেশ চলছিল।

সমুকে উদ্দেশ্য করে তাকেই যে কথাগুলো বলা হল তা কি সুনেত্রা বুঝতে পারে নি? অবশ্য মহিলার কথায় পাত্তা না দিয়ে শেফালিকে রেখে দিয়েছে। এমনিতেই বা কত পাত্তা দেয়। খুব অনায়াসেই স্টিয়ারিং ধরবার দায়িত্ব হাতে নিয়ে নিয়েছে সে। হলে কি হবে মাসের শেষে পেট্রলের অভাব। তখন শাশুড়ির মতই আধখানা ডিমের ঝোল। এক পিস মাছকে দু'পিস বানানো এসব কায়দা করতে হয়। শাশুড়ি কিছু বলে না কিন্তু তার নীরব দৃষ্টি ওকে খানিকটা অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দেয়। যে কিপটেমোর অজুহাত তুলে সে সংসারের চাবিকাঠি তুলে নিয়েছে সে কিপ্‌টেমোর দোষে আজ সে নিজেই আক্রান্ত। ওইটুকু মেয়ে পামি তার শতেক খরচা। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াবার শখ হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাচ্ছে। রেস্টুরেন্টে খাওয়া সিনেমা দেখা এসব সাধ আহ্লাদে ধামাচাপা দিতে হয়েছে।

সৌম্যকে ভালবেসে বিয়ে করেছে সুনেত্রা। বি. এ. পাশ সুশ্রী সুনেত্রার আরও ভাল বিয়ে হতে পারত। কিন্তু কি যে হল। সৌম্যর প্রেমে হাবুডুবু হয়ে গেল। তখন বড় চাকরি আর্থিক আনুকূল্য তুচ্ছ মনে হয়েছিল। সৌম্যর হাসিখুশী সুন্দর স্মার্ট চেহারাই হয়ত এর জন্য দায়ী। সুনেত্রার ব্যবসায়ী বাবা এ বিয়েতে আপত্তি করে নি। বরং খুশি হয়েছিল। সরকারি অফিসারের একমাত্র ছেলে, কোলকাতায় ফ্ল্যাট তার সঞ্চিত সব অর্থই তো সেই পুত্রের। ভদ্রলোকের হিসেব কিছুটা ভুল হয়েছিল। সৌম্যের বাবা সুবীর বোসকে দীর্ঘদিন ধরে মা ভাইবোনদের টানতে হয়েছিল। এছাড়া বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন কার কখন কি প্রয়োজন সুবীর বোস তক্ষুনি তার মাথায় ছাতা ধরেছে। পরিণতি হিসেবে সংসারটা ছিল অভাবে মোড়া। একান্ত অনুরাগিনী স্ত্রী কাজলের সমর্থন ছাড়া হয়ত সুবীর এতটা উদারতা দেখাতে পারত না। সুবীরের প্রাণখোলা হাসি আর স্বচ্ছ ব্যবহার কেমন করে যেন অভাবের ছায়া সরিয়ে দিত। তবু কাজলকে সামাল দিতে হত সবকিছু। অভাবের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে জেদ চেপে গেছিল কাজলের। যে করেই হোক ফ্ল্যাট কিনতে হবে। দেনা হয়েছিল ভালমত। তবে এ ফ্ল্যাটে দিন কাটাবার সৌভাগ্য হয় নি সুবীরের। ভাড়া বাড়িতেই খাবার টেবিলে বসে হাসতে হাসতে একদিন ঝট্ করে ওপরে যাত্রা করেছিল।

সৌম্য যেদিন প্রথম তার মা'র সঙ্গে সুনেত্রার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল—সুনেত্রার মন্দ লাগেনি ভাবী শাশুড়িকে। ছিপছিপে লম্বা চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ। মিষ্টি হেসে সুনেত্রার থুতনি স্পর্শ করেছিল কাজল। বলেছিল কী মিষ্টি দেখতে তোমাকে। উনি বেঁচে থাকলে বড় খুশী হতেন। দু'চোখ জলে পরিপূর্ণ হতে দেখে মা'র মন ঘুরিয়ে দিয়েছিল সৌম্য।

—ওই গানটা গাও তো মা—কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছলভরে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের গলা। একটু সেকেলে হলেও ভারী সুরেলা। সেদিন বেশ দরদ দিয়ে গানটা গেয়েছিল কাজল। কিন্তু বিয়ের পর ক'দিন যেতে না যেতেই বুঝতে পারা গিয়েছিল সৌম্যর মা একটু বেশী রকমের কিপ্টে। মোটামুটি স্বচ্ছল সুনেত্রার বাপের বাড়ি। বড় বড় দু'পিস মাছ পাতে দেবার পরও তার মা সাধাসাধি করত আরেকটা নেবার জন্য। এখানে সপ্তাহে চারদিন মাছ তাও কী ছোট পিস। রাগের চোটে মাছ পাতে ফেলে রাখে সুনেত্রা। কি হল মাছ খেলে না? কাজলের জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বলে ওঠে, ইচ্ছে করছে না খেতে। ডালের সঙ্গে পাঁচমিশেলি ঘ্যাটটা আরও অসহ্য।

মাস দুই বাদে এক রাতে সুনেত্রা সৌম্যকে বলেছিল আলাদা বাড়ি দেখ। তোমার মার সঙ্গে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কি উত্তর দেবে ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি সৌম্য। শুধু এটুকু সে বুঝেছিল যে মা'র ছত্রছায়া থেকে বিদায় নিলে না খেয়ে মরতে হবে। বাড়ি ভাড়া করতে গেলে তার যা মাইনে পুরোটাই বাড়িওয়ালাকে দিতে হবে। মা'র পেনশনের টাকায় বাড়ির লোন শোধ হচ্ছে তা কি সে জানে না? সামান্য সাহস সঞ্চয় করে বৌকে বোঝাতে চেয়েছিল। ফল হয় নি। পাশ ফিরে রাগ দেখিয়েছে। সৌম্য বলেছিল—আমি তো কিছু গোপন করে বিয়ে করি নি। আমার মত সাধারণ মাপের ছেলেকে তোমার বিয়ে করা উচিত হয় নি। উত্তর দেয় নি সুনেত্রা। তবে নতুন বিবাহজনিত রোমান্সে ঘুন ধরেছিল তা বোঝা গিয়েছিল।

সুনেত্রা কিন্তু বেশ দাপটের সঙ্গেই টিকে গেল এ বাড়িতে। কেননা কবে যেন কাজল দেখতে পেল সে তার ওয়ানরুম ফ্ল্যাটের ডাইনিং কাম ড্রইং রুমের ডিভান ওরফে বসবার জায়গা ওরফে শোবার জায়গাটিতে দু'হাটু জড়ো করে তার ওপর মুখ রেখে বসে আছে। বাড়ির সব কাজ শেফালি আর সুনেত্রার মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছে। ভালই হয়েছে ভাবে কাজল। এ বয়সে দৌড়ে দৌড়ে কাজ করা কি পোষায়? সান্ত্বনা পেতে গিয়ে বুকের কোথায় যেন ধাক্কা লাগে। সকাল নটার ভেতর সৌম্য বেরিয়ে যায়। তার আগে মা ব্যাটাতে ফুলঝুড়ির মত দু'চারটে কথা হয় তাতে প্রাণের স্পর্শ নেই। নেহাতই দায়সারা গোছের ডায়লগ। কখনো সখনো সে বই মুখে বসে থাকে। মন দিতে পারে না। চারপাশে মরুভূমির তপ্ত নিশ্বাস। অথচ সুবীর বেঁচে থাকতে শত অভাবেও এ বাড়ির গাছপালায় ছিল কত ফলফুলের সমারোহ।

পামি পেটে আসার পর ভরা মাসে সুনেত্রা বাপের বাড়ি গেল। সে সময় ক্ষণিক ওয়েসিসের দেখা মিলেছিল। সমু কেমন আগের মতই সহজ স্বচ্ছন্দ। রান্নাঘরে কাজলের ব্যস্ততা। বড় নিশ্চিন্ততার জীবন যেন। সঙ্কোচহীন নির্ভয়। যেদিন মাস দুইয়েকের পামিকে নিয়ে ফিরে এল সুনেত্রা সেদিন হাতপা নাড়া জ্যান্তপুতুল কাজলকে আপ্লুত করে ফেলল। ভারী ফুটফুটে। সুবীর থাকলে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে দিত। ওথলানো দুধের মত স্নেহ কোন বাধা মানে না। হাত বাড়িয়ে কোলে নিতে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সুনেত্রার বড়সড় দাবাড়ানি। কোলে নিচ্ছেন যে! ডেটল সাবান দিয়ে হাত ধুয়েছেন? এত বয়স হল এটুকু শেখেন নি?

ধমক খেয়ে ওথলানো দুধ নেমে আসে। আগুনে পুড়তে থাকে সে দুধ। কাজল গুটিয়ে নিল নিজেকে।

সত্যিকথা বলতে কি সমুর বিয়ে দিয়ে এমনভাবে পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়তে হবে আগে ভাবা যায় নি। সুবীর নেই ঠিক কথা। কিন্তু বাড়িটা তো ভর্তি। পামির হাসিকান্নাতেই তো ফ্ল্যাট গম্‌গমে। অথচ কেন যেন এক গভীর শূন্যতা বোধ চেপে ধরে তাকে বোঝা যায় না। কর্মহীন কাজল বসে বসে সুবীরের চিন্তা করে।

সে স্মৃতি বয়ে আনে কত ফুলের সুবাস। দাদা দিদি যার বাড়িতেই যেত কাজল, সুবীরের ফোনের জ্বালায় অস্থির হতে হত তাকে। একটাই কথা। এক্ষুনি চলে এস। বুড়োবয়সে সুবীরের আদেখলাপনায় সবার সামনে বিব্রত হতে হয়েছে। বাড়ি ফিরে এসে চোখ পাকিয়ে কিছু বলতে গেলেই সুবীরের হাসি হাসি উদ্ভাসিত মুখ। ভাল করেই জান গিন্নী তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারি না। দীর্ঘ দু-দিন কথাটা টেনে টেনে বলত সুবীর। তারপর? চল চল কেষ্ট কাফেতে আজ কাটলেট খেয়ে আসি। বাড়ি ফিরে তোমার হাতে এক কাপ কড়া চা। তো এই ছিল সুবীর। সেই বিরক্তি সেই লজ্জাবোধ ভালবাসার হীরে হয়ে হৃদয়গভীরে আলো ছড়াচ্ছে। যে ক'ঘণ্টা ছেড়ে থাকতে পারত না আজ কতদিন হল তার দেখা নেই। চোখ দিয়ে জল গড়াতে কাজল তাড়াতাড়ি উঠে বাথরুমে যায়। চোখের জলের ন্যাকামোকে ঠিক সহ্য করতে পারে না সুনেত্রা। অবশ্য অনেক কিছু তার অপছন্দের তালিকায় আছে। অথচ আলাদা থাকার কথা ভাবামাত্র যেন কবরে ঢুকে যায় কাজল। সমুকে ছেড়ে থাকার কথা মনে আনা যায় না।

—ঠামা ওঠ। চা হয়্যা গিয়েচে।

শেফালির ডাকে ঘুম ভাঙ্গে। বারান্দার খোলা দরজা দিয়ে ডিভান কাম তার বিছানা রোদে ভেসে যাচ্ছে। রোদ দেখে বুঝেছে আজ রবিবার। ভোরে ব্যস্ততার শব্দ নেই বলে ঘুম ভাঙ্গে নি। প্রতি রবিবারই এক চাপা অস্বস্তি চেতনার তলায় আড়ি পেতে থাকে। সে কি জানে না সপ্তাহান্তে এই দিনটি আনন্দবার্তা বহন করে আনে? দেরী করে ঘুম থেকে ওঠা ভালমন্দ খাওয়াদাওয়া, হাসিগল্পের আমেজে পরিপূর্ণ রবিবার? অথচ ছেলে ছেলের বৌএর হাসিঠাট্টা গালগল্পের মাঝে নিজেকে বড়ই বেমানান লাগে। বেলা এগারোটা অবধি কোনরকমে সময় কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। আসলে খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে চায়। দু'দণ্ড স্বাভাবিক জীবনস্রোতে বইবার আসায় এ ফ্ল্যাট ও ফ্ল্যাট ঘোরাঘুরি। সব চেয়ে নির্ঝঞ্ঝাট পাশের ফ্ল্যাটের অবিবাহিতা নন্দিতাদি। দেয়ালঘড়ির বন্ধুর ভূমিকা। ঘন ঘন সময় দেখে সে। সকালে উঠে প্রাত্যহিক কাজগুলো কখন হয়ে যায়। বারান্দার তার থেকে কিছু জামাকাপড় তোলা কিংবা মেলে দেওয়ায় সময় কাটায় কিছুটা। তারপর কাগজ মুখে বসে। ডিভানে বসে বসে শেফালির চিৎকার শোনে। বৌদিমণি ডিমের ডালনা পাতলা না ঘন হবে? গরমমশলা কতটা দিব দ্যাখায়ে দাও। সুন্দরবনের অশিক্ষিত মেয়েটা এ বাড়িতে কাজলের চেয়ার কোনটি তা জানে।

একদিন এক রবিবার আচমকা কাজলের দাদা সজল তার দুই ছেলে শুভ সমুকে নিয়ে উপস্থিত। দেখে কাজলের কণ্ঠরুদ্ধ। ঝড়ে পড়েছে একরাশ অভিমান—এতদিনে তোমার সময় হল দাদা?

সজল বলেছিল, কি করব বল? সাতসতেরো ঝঞ্ঝাট। বেরোন আর হয়ে উঠে না। নে চল কেমন হল তোর নাতনি দেখে আসি।

ঘুমন্ত নাতনিকে কোলে তুলে দেখতে দেখতে সজল বলেছিল, বাঃ দারুন দেখতে হয়েছে তো দিদিভাইকে।

শুভ সনু ঝুঁকে পড়ে বাচ্চার মুখ দেখে। পকেট হাতড়ে লাল রঙের ছোট বাক্স বের করেছে সজল। সোনার আঙটি বার করে বলেছে—দিদুভাই এর পছন্দ হবে কি বল?

শুভ সনু হাত না ধুয়েই বাচ্চাকে নিয়ে লোফালুফি শুরু করেছে।

কতদিন পরে যে কাজলের গায়ে তাজা হওয়ার স্পর্শ। কেমন এক ভাল লাগার ছন্দ দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে তাকে। কাজলের দাদা বলল, নতুন অতিথিকে নিয়ে এত ব্যস্ত যে আমাদের কথা ভুলেই গেছিস।

তাই তো! এমন এক ভালবাসার পরিমণ্ডলকে সে কিভাবে এতদিন ভুলে ছিল? মনে হতেই সে ভাইপোদের দিকে তাকাল। পিসি বলতে অস্থির অতিপ্রিয় শুভ সনু ঘরে ঢুকেই তাকে জড়িয়ে ধরে আদর দেখিয়েছে। অল্পবয়সের চেহারায় ওদের সেই গ্রাম্যভাব কোথায় উধাও। আশ্চর্য লাগছে। আভিজাত্য মোড়া কী ঝক্‌ঝকে চেহারা। এতদিন কি এই পরিবর্তন তার চোখে পড়ে নি?

—কদিন তোদের দেখা নেই। বড়সড় হয়ে পিসিকে ভুলে গেছিস।

—নারে ভোলে নি ওরা। দেখা হলেই আমাকে তোর কথা বলে। তবে কি জানিস? ওপরে ঘূর্ণায়মান পাখা সত্ত্বেও সজল রুমাল বার করে মুখের ঘাম মোছে। এখন ওরা প্রচণ্ড দায়িত্বপূর্ণ কাজে আছে, সময় কোথায়? তোকে তো সুখবরগুলোই জানানো হয় নি। সনু এবার ডি. জি. এম হল। গার্ডেনরিচ সিপ্ বিল্ডার্সে আছে তা তো জানিস। এত অল্পবয়সে এতটা ওপরে উঠবে ভাবা যায় নি। শুভ আই আই টি ছেড়ে সায়েন্স কলেজে এসেছে। মাস দুই বাদে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে আমেরিকা যাচ্ছে। বরফের ওপর সূর্যালোক পড়লে তার প্রখর দ্যুতিতে চোখ ঝল্‌সে যায়। দাদার মুখে কাজল সেই দ্যুতির ঝলক দেখে চোখ সরিয়ে নিয়েছে। কি আশ্চর্য ওদের সুখবরে আহ্লাদ হচ্ছে না। বরং বুকের ভেতর বেদনার মোচড়। এমন সময় বাজারের থলে হাতে ঘর্মাক্ত বিদ্ধস্ত সমুর আগমন। মুখে একরাশ ওপচানো হাসি। আরেব্বাস! তোমরা কতক্ষণ?

এরপর সুস্থ সুন্দর একটি সংসারের ছবি ফুটে উঠেছিল চোখের সামনে। ম্যাক্সিপরা পুত্রবধূ কখন কপালে টিপ পরনে শাড়ি বাঙালি গৃহবধূতে রূপান্তরিত হয়েছে। মামাশ্বশুর ভাশুরদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছে। অসময়ে চা নিমকি দিয়ে আপ্যায়িত করেছে। সমুকে ফের বাজারে পাঠিয়ে মাছ মাংস মিষ্টি আনিয়েছে। সামান্য দেরী হল। কিন্তু বিয়েতে পাওয়া লাও অপলার বাসনে নানা পদ সাজিয়ে

খাবার পরিবেশন করল। ওরা সোচ্চারে সুনেত্রার রান্নার প্রশংসা করছে। পুত্রবধূর প্রশংসা শুনে কেমন এক ভাললাগায় মন খুশী হয়ে ওঠে কাজলের। বিদায় নেবার সময় সজল তো বলেই ফেলল—যাই বল আমাদের বৌমাটির স্বভাব খুব ভাল। সুবীর বেঁচে থাকলে কত শান্তি পেত বল তো? হয় গরমে নয় অধিক কোলাহলে পামি পরিত্রাহি কান্না জুড়েছে। সৌম্য মেয়েকে সামলাচ্ছে। সারাদিনে বাড়ির তাথৈ অবস্থা। সুনেত্রা শেফালির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। সৌম্য বলেছিল—মা মামুদের এগিয়ে দিয়ে এসো।

নীচে লাল রঙের চক্‌চকে নতুন কেনা মারুতির সামনে আড্ডা জমে উঠেছে। বিষয়বস্তু সুবীরের স্মৃতিচারণ। পিসিকে সাক্ষী রেখে দু'ভাই পিসের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছেলেবেলার টুকরো-টাকরা আনন্দদায়ক ঘটনার বিবৃতি দেয়। লাইট হাউসে পিসের হাত ধরে প্রথম ইংরেজী ছবি অড্রে হেপবার্নের রোমান হলিডে। ওঃ দুরাত ওরা ঘুমোতে পারে নি ছবিটি দেখার পর। এছাড়া স্যাঙ্গুভ্যালির বিখ্যাত ভেজিটেবল চপের স্বাদগ্রহণ, হলিডে ইন আইসে জমা বরফের ওপর মেমসাহেবদের নৃত্য প্রদর্শনী দেখে আধাশহুরে ছেলে দুটির ভ্যাবলা মেরে যাওয়া—ওদের উচ্চগ্রামে হাসির আওয়াজ কাজলের বুকের মধ্যে সেধিয়ে যায়।

চুলের ভেতর আঙ্গুল চালাতে চালাতে সজল বলে ওঠে—সত্যি রে তোদের বাড়িটা ছিল যেন অতিথিশালা। কে না উঠেছে বলত? সুবীরের মত লোক আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কাজল দেখছিল তার দাদার শরীরে এখনও কী বাঁধন! অথচ সে নিজে আয়নায় নিজেকে দেখে নিজেই চমকায়। অসম্ভব বুড়োটে ছবি। আয়নার কাঁচে যেন ভেঙ্গচি কাটে।

—সমুর বিয়ে দিয়েছিস। এখন ঝাড়া হাতপা। আমাদের ওখানে থেকে আয় কিছুদিন।

অন্যমনস্ক কাজল চমকে যায় দাদার কথায়। তবে ভাবনা আসে এক ঈর্ষান্বিত তুলনাবোধে। একই মায়ের পেটের ভাইবোন অথচ দাদার ভাগ্য তাকে কোথায় তুলে নিয়ে গিয়েছে। দুই ছেলে এক মেয়ে যেন তালগাছ। তড়বড়িয়ে উঠে আকাশ ছুঁয়েছে। স্বাচ্ছল্য আর সুখ হাত ধরাধরি করে চলেছে। তিন ছেলে মেয়ের বালিগঞ্জ বেহালা গল্ফগ্রীনে নিজস্ব ফ্ল্যাট। নৈহাটিতে দাদার আমজাম সহ বিরাট বাগানবাড়ি। মনস্ক হয়ে কাজল দেখল ওরা এখনও সুবীরের খুঁটিনাটি কথা আর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। হঠাৎ স্বর্গত স্বামীর ওপর সুতীব্র অভিমানে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে কাজল। কেউ জানুক বা না জানুক সে তো জানে অতিথিবৎসল হতে গিয়ে কিভাবে সুবীরকে দেনার দায়ে জর্জরিত হতে হয়েছে। পড়শুনার কত ক্ষতি হয়েছে একমাত্র পুত্রের। সারাজীবনেও সে তালগাছ হতে পারবে না তা জানে কাজল।

মারুতির গায়ে দু'বার টোকা মেরে কাজলের দাদা বলল গাড়িটা কেমন হয়েছে বললি না? অ্যামবাসারটা বিক্রি করে দিয়েছে সনু। শুভ যে কেন ফিয়াট কিনতে গেল বুঝলাম না। যাই বল ফিয়াট গাড়িতে কোন চার্ম নেই।

গাড়ি স্টার্ট দেবার মুখে তিনজনের কাছ থেকেই তাদের বাড়ি যাবার জন্য ঘন অনুরোধ আসে। দাঁড়িয়েছিল কাজল যতক্ষণ না রাস্তার বাঁকে লাল রঙ নিশ্চিহ্ন হল। টুক্‌টুক আলো জ্বলে উঠেছে চারপাশে। অথচ বুকের ভেতর একরাশ অন্ধকারের বোঝা নিয়ে কাজলের হাঁফ ধরে যাচ্ছে। চারতলায় উঠতে গিয়ে মনে হল এক যুগ। শান্তশিষ্ট কাজলের কেন যেন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছে। অদ্ভুত রাগ পেয়ে বসেছে তাকে। কাজলকে অচেনা মনে হয় কারণ ঘরে ঢুকেই সে সশব্দ চিৎকারে ফেটে পড়ে—সমু কত টাকা মাইনে পাস যে এক লহমায় শ দুয়েক টাকা উড়িয়ে দিলি? সাবধান না হলে গাছতলায় বসতে হবে সে খেয়াল আছে? ফ্ল্যাটের দেনা এখনও শোধ হয় নি সে খেয়াল রাখিস?

পূর্ববেশে ফিরে যাওয়া ম্যাক্সিপরা সুনেত্রা ছুটে এসেছে মেয়েকে ছেড়ে। আপনার মত হাড়কিপ্‌টে লোক কোথাও দেখিনি। আরে বাবা ওরা তো আপনার দিকের লোক। আমার বাপের বাড়ির লোক হলেও বা কথা ছিল। বিয়ের পর ওরা আমাদের ভুড়িভোজ করে খাইয়েছে সে কথা আপনি ভুলে যেতে পারেন আমরা পারি না। আমাদের আত্মসম্মান আছে, আপনার দেখছি সেটুকুও নেই। ফুঁসে ওঠা সাপের মাথা লাঠির ঘা খেলে যেমন নুয়ে আসে কাজলের সেদিন সে অবস্থা হয়েছিল। খুব ধীরে বলেছিল কাজল, তোমাদের ভালর জন্যই বলছি সুনেত্রা।

—আমাদের ভাল আমাদের বুঝতে দিন। ভাল চাইলে পেনশনের টাকা দিয়ে ছেলেকে সাহায্য করতে পারেন না? সব বুঝে বিনেপয়সায় ছেলের ঘাড়ে বসে খেতেন না তাহলে।

কাজলের জীবনের ছক্‌টা পাল্টে গেল এ ঘটনার পরে। পরের মাসে পেনশনের টাকা পেতেই গুনে গুনে ছ'শো টাকা সমুর হাতে দিল। সমু অবশ্য অনেকবার বলেছিল টাকা দেবার কি দরকার মা? তোমার কাছেই রাখ। এখনও ফ্ল্যাটের দেনা শোধ হয় নি ইত্যাদি। মুখে বলেছে বটে তবে তার উদ্দীপ্ত মুখ চোখ এড়ায় নি কাজলের। ক'দিন বাদে কাজলকে কাপড়ের ব্যাগে সায়া শাড়ি ঢোকাতে দেখে সামান্য ভয় পেয়েছিল সুনেত্রা।

—যাচ্ছেন কোথায়?

—দাদার বাড়ি। ক'দিন ঘুরে আসি। সমু এলে বলে দিও। সেবার দিন পনরো কাজল দাদার বাড়িতে কাটাল। খুব আদর সেখানে। এক আঁধাশহরে কলেজের অধ্যাপক ছিল সজল। সে সময় শিক্ষকতার মাইনে এত কম ছিল যে ডানে আনতে বাঁয়ে কুলোত না। তিন তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে নাজেহাল অবস্থা। সবীর তার পাশে

ছিল বরাবর। শুভ সনু পিসির বাড়ি থেকে জয়েন্ট এন্ট্রেন্স পরীক্ষা দিয়েছিল। সুচরিতা দেখতে ভাল ছিল কিন্তু মুখে ব্রনর মত কিসব উঠেছিল। সুবীর মেয়েকে কোলকাতায় আনিয়ে স্কিন স্পেশালিষ্ট ডক্টর পাঁজাকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছে। সেই সুচরিতার গাড়ি ফ্ল্যাট ছেলে মেয়ে নিয়ে সুখের সংসার। বাপের বাড়িতে পিসিকে দেখে নিজের কাছে নিয়ে এল। বসাকের দোকান থেকে শাড়ি কিনে দিল। এদের সবার কাছে তার আসন যে অনেক উঁচুতে তা কাজল হৃদয়ঙ্গম করছে। আসলে বুঝতে পেরেছে সে সুবীর নামক বটগাছটি নেই বটে তবে তার শীতল ছায়ার বিস্তৃতি তেমনিই রয়ে গেছে।

এত আদর আহ্লাদ। তবু বুকের মাঝে অস্বস্তির টিক্‌টিক্ শব্দ। দাদাকে ফোন করেছে কাজল। সমু ফোন করেছিল?

—কই না তো।

—ফোন করলে বলো আমি এখানে আছি।

এরপর শুভ সনুর বাড়ি থেকেও দাদাকে ফোন করেছে কাজল। হতাশ হয়েছে। বাড়িতে ফোন করতে হাত ওঠে নি। মা'কে নিয়ে সমুর কি একটুও উদ্বেগ নেই?

পামির জন্য ঠেলাওয়ালার কাছ থেকে সস্তার পুতুল কিনল কাজল। প্রায় এক মাস বাদ বাড়ি ফিরছে। সমুর সঙ্গে দেখা হতেই কাজল জিজ্ঞেস করল, সমু ফোন খারাপ ছিল নাকি?

—না তো।

—তবে ফোন করিস নি কেন?

—তুমিই তো করতে পারতে। তাছাড়া কোথায় তুমি ছিলে জানব কি করে?

কাজল চুপ করে গিয়েছিল। বুকের জগদ্দল পাথরটাকে ঠেলেও সরাতে পারে নি। ডিভানের পাশেই সুবীরের অল্পবয়সের হাসিমুখ ছবি। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল কাজল। বটগাছের বিস্তৃতির অনুসন্ধানে বুঝি। কারণ এবার ওর দুই দেওর এক ননদ এবং আরও দু'চার জনের কথা, যারা সুবীরের দ্বারা উপকৃত হয়েছিল, মনে পড়ল তাদের কথা। কাজল মনে মনে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার ছক কাটে। ঘোরবার স্ট্র্যাটেজি নিজে নিজেই ঠিক করে নিল। প্রথম প্রথম সামান্য সঙ্কোচ বা নার্ভাসনেসে কাহিল হয়েছিল। তবে এসব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে দেরী লাগে নি। প্রথম রাউন্ডে যাদের বাড়িতে যায় দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাউন্ডে তাদের ধারে কাছে যায় না। এভাবে এক একজনের বাড়ি যেতে বছর ঘুরে যায়। দুই বা তিনদিনের বেশী সে কারো বাড়িতে থাকে না। একমাত্র দাদা আর বড়দির কথা আলাদা। সেখানে দশদিনেও সঙ্কোচহীন, কারো কাছ থেকে আজ পর্যন্ত খারাপ ব্যবহার পায় নি। ওর হাসিমুখ নম্র ব্যবহার বা আভিজাত্য হয়ত অপরের আদর কাড়তে সক্ষম হয়েছে অথবা সুবীরের ভালবাসার রেশ এখনও মিলিয়ে যায় নি।

মাঝে মাঝে ঘোরাঘুরিতে ক্লান্ত কাজল স্থিতিলাভের আশায় বুক বেঁধেছে। কোথাও যাওয়া আসার পরিশ্রম আর সহ্য হচ্ছে না বুঝতে পারা যাচ্ছে। কিন্তু পামির কচিস্বরে কথা বলা শেফালির রান্নার শব্দ সমু সুনেত্রার হাসিগল্প সব থাকা সত্ত্বেও দুই বড়জোর তিনমাস বাদে মরুভূমির নৈঃশব্দে কাজলের দিনরাত শুষ্ক ও নীরস হতে থাকে। তখন আবার ব্যাগ বার করে কাপড় গোছাতে বসে যায় সে।

সুনেত্রা জানে এক্ষুনি বেল বাজবে। এর পরের ঘটনাগুলো তার মুখস্ত। দরজা খুলতেই মহিলা সুনেত্রার দিকে করুণ চোখ তুলে বলবে—তোমরা সব ভাল ছিলে তো?

হ্যাঁ অর্থক মাথা ঝাঁকিয়ে সেও তোতাপাখির মত বলবে—

—চা খাবেন?

—তা দাও এক কাপ।

শেফালিকে চা করতে বলে শোবার ঘরে রাখা বিস্কুটের টিন খুলে বিস্কুট বার করবে সুনেত্রা।

আবার বিস্কুট কেন বলে হাত বাড়াবে মহিলা। পামি উপস্থিত থাকলে সে টুকটুক হেঁটে ঠামার কোল ঘেষে দাঁড়াবে। মহিলা তৎক্ষণাৎ ব্যাগের ভেতর হাত চালিয়ে ছোট সাইজের ক্যাডবেরি বার করবে। একবার পামির জন্য একটা দামী ফ্রক বার করতে সন্দেহ হয়েছিল সুনেত্রার। সে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেছিল ফ্রকটা কে দিল?

—সুচরিতা।

—আমার মেয়ের জন্য কারো কাছে কিছু চাইবেন না।

—চাইব কেন? সুচরিতা ছাড়ছিল না কিছুতে তাই পামির জন্মদিন বলতে বাধ্য হয়েছিলাম।

—আমরা কাউকে কিছু দিই না। লোকের জিনিস নিতে ভীষণ খারাপ লাগে।

কাজলের ব্যাগ থেকে নতুন শাড়ি বার হতে দেখেছিল সুনেত্রা। তাই হয়ত মনের ঝাল মিটিয়ে নিল। তবে আজকাল কী যে হয়েছে মহিলার। পুজোর সময় পর্যন্ত নতুন শাড়ি নেয় না।

বেল বাজল। দরজা খুলল সুনেত্রা। হঠাৎ পৌনঃপুনিকতা দোষে দুষ্ট দৃশ্য বদলে যায়। ধরফড়িয়ে ঘরে ঢুকে রাস্তার কাপড়েই ডিভানের ওপর শুয়ে পড়েছে কাজল। দ্রুত শ্বাস ওঠানামা করে। সে বলে—এক গ্লাস জল দেবে?

জলের গ্লাস এগিয়ে দিতে দিতে সুনেত্রা বলল, কি হল কি আপনার? শরীর খারাপ নাকি?

—নাঃ তেমন কিছু নয়। শুধু বুকটা সামান্য ধড়ফড় করছে। বাঁ বুকে তীব্র কন্‌কনে ব্যথা। আজকাল প্রায়ই ব্যাথাটা হচ্ছে। সেখানে হাত রেখে চোখ বুজেছে।

কি ভেবে সুনেত্রা কপালে হাত রাখে। ঠাণ্ডা। জ্বরের তাপ নেই। এত ঘুরলে শরীর খারাপ হবে না? তার মানে ভালই ভেঙ্গেছে শরীর। যাক্‌গে—বলে সুনেত্রা 'মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে বকের পাতি' গানটা সোচ্চারে গুণগুণ করে। পাড়ার ফাংশনে গানটার সঙ্গে নাচবে পামি। অফিস ফেরত মাকে শোওয়া দেখে সৌম্য জিজ্ঞেস করল কখন এসেছে?

—তা ঘণ্টা তিনেক। বলছেন বুক ধড়ফড় করছে। অনেকদিন পর মার পাশে বসল সৌম্য। কপালে হাত দিল। নাড়ি দেখল। এতদিন সে কি তার মাকে দেখেনি? একি চেহারা? ঘন কালো চুল অদৃশ্য। সাদা রঙের ক'টি চুল! মাঝে মাঝে টাকের আক্রমণ। কালিপড়া চোখ, বিষণ্ণ গালভাঙ্গা মুখ—একি সমুর মা? আকাশি রঙের জমি ডীপ নীল রঙের চওড়াপাড় তাঁতের শাড়ি পরনে কপালে বড় লাল টিপ শিশুবয়সে মনে ছেপে থাকা মা'র ছবি হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে চোখের সামনে। হাতে বই এর ব্যাগ। একমুখ হাসি নিয়ে হাত ধরে রাস্তা পার করে দিচ্ছে মা। ক্লাসের পাকা ছেলে বুম্বা একদিন আধো আধো বুলিতে নাকি বলেছিল, তোল মা কি সিনেমা আর্টিস?

পরে মা একথা নিয়ে হাসাহাসি করাতে সৌম্যর হয়ত মনে আছে ঘটনাটি।

গলায় দলাপাকানো কান্না নিয়ে হুকুমের সুরে বলল সৌম্য—নেত্রা মাকে এক গ্লাস দুধ দাও।

কাজলের আপত্তি কানে তোলে নি সমু। জোর করে দুধ খাইয়েছিল। কিছুক্ষণ বাদ পুরো দুধ বমি হয়ে গেল।

সমু ডাক্তার ডাকবার জন্য রেডি হলে কাজল বলেছিল—সামান্য বদহজমের গণ্ডগোলে ডাক্তার কি করবে সমু? এক রাত উপোস দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তার না ডেকে আমায় বরং একটা....।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হেসেছিল সমু—কি কামপোজ? দিচ্ছি।

রাত বারোটা নাগাদ বাথরুম করতে ওঠে সমু দেখল মা পিঠে বালিশ ঠেকা দিয়ে খুব মনযোগ সহকারে ডায়রী লিখছে। দিনলিপি লেখা কাজলের বরাবরের অভ্যাস। জানে সমু।

—শরীর খারাপের ভেতর রাতজেগে ডায়রী লিখছ। লেখার কি দরকার?

—নেশা বাবা। কামপোজ খেয়েও ঘুম আসছে না। ভাবলাম ডায়রী লেখা যাক। এক্ষুনি শুয়ে পড়ছি।

পরদিন কাজলকে অঘোরে ঘুমোতে দেখে কারোই কোন সন্দেহ হয় নি। কারণ সমু তাকে কামপোজ দিয়েছিল। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ সমু খেতে বসে। ভাতের পাতে বসবার আগে বারকয়েক মা মা বলে চেঁচিয়েছিল সমু। উত্তর নেই। তখন শেফালি কাজলের গায়ে ধাক্কা মেরে বলল, ও ঠামা আর কত ঘুমোবে?

কাজলের স্থির হয়ে যাওয়া দেহটা আবিষ্কৃত হয়। ধাক্কায় হাতটা পড়ে যায়।

—ইমা ঠামা যে মরি গিচে।

শেফালির চিৎকারে ওয়ানরুম ফ্ল্যাটটা ওলটপালট হয়ে যায়।

ডায়রীটা ডিভানের ওপর পড়েছিল। শ্মশানে যাবার আগে সমু তুলে রেখেছিল আলমারির মাথায়। শোকের ভেতরও ডায়রীতে মা কি লিখে গেছে জানবার কৌতূহল দমন করা যায় নি। রাতের নিরিবিলিতে ডায়রীর পাতায় চোখ রাখে সৌম্য। পড়ে নিয়ে ডায়রীটা সুনেত্রার হাতে দেয়। দিনলিপি বলতে যা বোঝায় ঠিক সেরকম মনে হয় না সৌম্যর। মনের আবেগ যেন চিঠির আকারে লেখা।

ডায়রী পড়তে পড়তে সুনেত্রার মুখের রঙ পাল্টাতে থাকে। অক্ষরগুলো ঝাপ্‌সা দেখায় কিন্তু অর্থ বুঝতে কষ্ট হয় না। একবার পড়ে নিয়ে আবার পড়তে থাকে। আজ কেন কে জানে অনেক কথা লিখতে ইচ্ছে করছে। ডায়রীতে কি এত কথা লেখা যায়? সুবীর বড় উদারহৃদয় লোক ছিল। পরের উপকার করতে গিয়ে কি সমুর ওপর অবিচার হয় নি? ওর এডুকেশন নিয়ে তেমন চিন্তা করি নি। ভবিষ্যৎ ভাবি নি। আজকাল কেন কে জানে বড় অনুতাপ হয়। আমার কিপ্‌টেমো স্বভাব সুনেত্রার পছন্দ নয়। ছেলেমানুষ ওর সাধ আহ্লাদ থাকতেই পারে। এ কবছর আপ্রাণ চেষ্টা করে বেশ কিছু টাকা জমানো গেছে। বাঁ বুকে অনেকদিন ধরে কন্‌কনে ব্যথা। আজ খুব বেশী। ডাক্তারী পরিভাষায় এর নাম বোধ হয় অ্যানজাইনা পেক্টেরিস। হার্টের গণ্ডগোল বুঝতে পারছি। শরীরের যা অবস্থা! যে কোন মুহূর্তে চলে যেতে পারি। বাঁচার ইচ্ছে আর নেই, ওর কাছে যেতে চাই। সমুকে এবার সবকিছু বুঝিয়ে দিতে হবে। দাদার কাছে সব সার্টিফিকেটগুলো আছে। দাদা এবার হিসেব করে বলল একয় বছরে প্রায় লাখ টাকার মত ব্যালেন্স হয়েছে। সমুদের জন্য কিছু করতে পেরে খুব....। এরপরের লেখাগুলো আর পড়া যাচ্ছে না। ইকরিমিকরি হয়ে গেছে। কিন্তু ভীষণ স্পষ্টভাবে একান্ত নির্লোভ স্বার্থহীন সৌম্যর মাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কাজলের আকস্মিক মৃত্যু সুনেত্রার মনে প্রভাব ফেলে নি বললে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু ডায়রীর অক্ষরগুলি যেন শরীরের মধ্যে লাভাস্রোত বইয়ে দিল। প্রচণ্ড কাঁপুনি শরীরে। ওর প্রতি দীর্ঘদিনের অবহেলা, তুচ্ছতা, অপমানজনক উক্তি সব জট পাকিয়ে এখন লৌহপিণ্ড। সশব্দে ধাক্কা মারছে চেতনায়। অনুতাপের জ্বালা এত তীব্র তা জানা ছিল না। অসহনীয় এই যন্ত্রণার কথা কাউকে জানানো যাবে না। সৌম্যকেও নয়। মাত্র একবার জীবন্ত কাজলকে মা বলে ডাকার ইচ্ছেয় ভেতরটা চূরমার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্বপ্ন কি সত্যি হয়? হয় না। তাই ওর কাঙ্খিত স্বপ্নটা ভেঙ্গে যাচ্ছে। ভেঙ্গেই যাচ্ছে।

স্বপ্ন কখনো...

সি আর পার্কের এক নম্বর বাজারে মাছের গন্ধ বড় তীব্র। সন্ধ্যে নামতে না নামতেই বিপুল সংখ্যক বাঙ্গালীর ভীড় এখানে উপছে পড়ে। গন্ধের তোয়াক্কা করে না। সানবাঁধানো উঁচু চত্বরের ওপর নানারকম মাছের পাহাড়। নিচে জলকাদা মাখামাখি রাস্তা। ভীড়ের ভেতর সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশে আছে দিল্লীর নামী দামী সুপ্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালী। হুমড়ি খেয়ে মাছ কিনছে। বলতে দ্বিধা নেই আমিও এক বাঙ্গালী, ভীড় বাড়িয়েছি। তবে নাকে রুমালচাপা। সব্জীফলের বাজার অগেই সারা হয়ে গেছে। মাছভর্তি সেলোফিন ব্যাগ গণশার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম—নে চ...

বাজারের সিঁড়িভেঙ্গে ওপরে উঠে তবে স্বাভাবিক হাঁটা। চাবি ঠেকিয়ে গাড়ির দরজা খুলতে যাব এমন সময়—এই অর্ক দ্বারা দ্বারা... দেখি রাস্তার ধারে সার দিয়ে দাঁড়ানো বিভিন্ন ঢংএর গাড়ির ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে দীর্ঘকায় সোমনাথ এগিয়ে আসছে। ওর লম্বু চেহারা হাসিখুশি মুখ অ্যাদ্দিন বাদেও আমায় চিনিয়ে দিল। পিঠে এক থাবড়া মেরে বলল—কিরে চিন্তে পারছিস?

—আগামী বিশ বছর বাদ দেখলেও তোকে চিনতে কষ্ট হবে না রে সোমনাথ।

আমার দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে সোমনাথ বলল—তোর চেহারায় কিন্তু একটুও পরিবর্তন আসে নি। অদ্দূর থেকে দেখেও ঠিক চিনতে পেরেছি।

হাসল সোমনাথ। —সংসারের জোয়াল কাঁধে নেই তো বুঝবি কি? ওঃ কদ্দিন বাদে দেখা—সোমনাথ ওর কাঁচা পাকা চুলে হাত চালায়।—সেই আই আই টি ছাড়বার পর সাকুল্যে বার তিনেক দেখা হয়েছে তাই না? এখন কি সেই ওখানেই আছিস? বিদেশী কনসার্নের নাম বলল সোমনাথ। মাথা ঝাঁকালাম। —এবার তোর খবর বল? ও. এন. জি. সি তেই আছিস? না অন্য কোথাও...

—না না ওখানেই কাটিয়ে দিলাম। সময় হয়ে এসেছে মাথার মুকুটটি এবার নামিয়ে দিতে হবে।

—কবে?

হাতের কর গুণে বলল সোমনাথ—আর ঠিক দু'মাস। থার্টি ফার্স্ট এপ্রিল বিদায়পর্ব। তোর?

—থার্টিফার্স্ট অগাস্ট।

—কি করবি ঠিক করেছিস?

—আর চাকরি নয়। কনসালটেন্সি করব ভাবছি। এখন থেকেই অনেক কোম্পানি ডাকাডাকি শুরু করেছে।

—স্বনামধন্য লোক। স্টেটসম্যানে তোর সম্বন্ধে লেখা বেরিয়েছিল। পড়েছি। ভালই উঠেছিস। সব খবর রাখি বুঝলি? গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে বললাম—তুই বা কম কিসে? তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ কথা বলবি। চল আমার বাড়ি। রাত্রে আমার সঙ্গে ডিনার করবি। তখন জমিয়ে গল্প করা যাবে।

কিছু দূরে দাঁড় করানো লাল রঙের মারুতি থাউজেন্ডকে ইশারায় দেখিয়ে সে বলল—সালা তার বৌ নিয়ে বসে আছে আমার অপেক্ষায়। যাব একদিন। থাকিস কোথায়?

—সুখদেব বিহার। নোটবুক বার করে ঠিকানা লিখতে লিখেতে বলল—আমার বম্বের ঠিকানা তোকে দিচ্ছি। সময় পেলে একবার পায়ের ধুলো দিস। ঠিকানা ধরিয়ে পেন পকেটে গুজতে গুজতে বলল—আচ্ছা ভাই চলি। এর মধ্যে একদিন আসব।

গাড়ি স্টার্ট করবার মুখে দেখি হন্তদন্ত হয়ে সোমনাথ ফের এদিকে আসছে। বাইরে থেকেই একটু ঝুঁকে বলল—বলতে ভুলে গেছিরে। খুব স্যাড নিউজ। সুদীপ যে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে ভাবতে পারি নি।

—মানে? কার কথা বলছিস? আসলে বিশ্বাস করতে পারি নি বলেই হয়ত প্রশ্নটা করেছিলাম।

—তোর অন্তরঙ্গ বন্ধু সুদীপের কথা বলছি। সেই যে খুব ভাল গান গাইত। স্বামী স্ত্রী ভ্রমণে বেরিয়েছিল। ট্রেনে হার্ট অ্যাটাক। এক সেকেন্ডের মধ্যে সব শেষ।

মারা গেছে সুদীপ! নিজের ভাঙ্গাচোরা স্বর নিজের কাছেই কিরকম বিকৃত শোনাল। স্টিয়ারিং এ-হাত রেখে কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চল হয়ে গেলাম। বুকের ভিতর তাজ্জব কাণ্ড চলছে। ভীষণ আনন্দ ভীষণ দুঃখ দুটো অনুভূতি যেন জড়াজড়ি করে বয়ে চলেছে। তার মানে আমার মাধু মাধবী একা পার্টনারহীন! সুদীপের হাস্যোজ্জ্বল সরল মুখ। আমার ওপর ওর দারুন রেসপেক্ট। এই বয়সে চলে গেল! অধ্যাপনার জীবন। রিটায়ার করতে এখনো বছর তিনেক বাকি ছিল। বুকের ভেতর এক অদ্ভুত বেদনার মোচড়। মনের খাতায় জমা স্মৃতিগুলো তরতাজা হয়ে ফিরে আসছে।

সব ছেলেরাই কৈশোরে পৌছে কিছু না কিছু স্বপ্ন দেখে। বন্ধুবান্ধব যতই থাক তার গোপন স্বপ্ন থাকে তার কাছে—আমারো ছিল। আমি অর্ক—স্কুলের ফার্স্ট বয়। সেকেন্ড বয় সোমনাথের সঙ্গে যার নম্বরের বেশ কিছুটা ফারাক থাকত। আর পাঁচজনের তুলনায় আমরা গরিব—কিন্তু তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যাথা ছিল

না। কারণ হয়ত পড়ার অফুরন্ত নেশা আর সঙ্গে সেই স্বপ্ন—একটা ছবি। শিশুবয়সে ঠাকুমার কাছে রূপকথা শুনতাম। হয়ত সেকারণে কৈশোরে পৌছতেই ছবিটি তার জায়গা পাকাপোক্ত করে নিয়েছিল আমার মনের গোপনতম ঘরে। কুঁচবরণ রাজকন্যে তার মেঘবরণ চুল (আমার নিজস্ব ধ্যানধারনা যুক্ত হয়েছিল তাতে) কুন্দশুভ্র দাঁতে মিষ্টি হাসি। টানা চোখে স্বপ্নালু দৃষ্টি। দৃপ্ত টান চেহারা তাতে আভিজাত্যের ছাপ। অবসরে ছবিটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতাম। এখবর কেউ জানত না। শুধু যখন তাকে পাব—তাকেই জানাব বলে।

ক্লাস টেন পর্যন্ত তেমন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল না আমার। আসলে কিছুটা অন্তর্মুখী ছিলাম আমি। হঠাৎ একটা ঘটনায় আমাদের ক্লাসের সুদীপ কালো বেঁটে মোটা, পড়াশোনায় মধ্যমাপের ছেলেটি আমার কাছাকছি এসে গেল।

দুর্গাপুজোর ছুটির পর সবে স্কুল 'খুলেছে' টিফিন পিরিয়ডে দীপ্তেশের দারুন চেঁচামেচি কানে এল। —এই শালা চুপে রুস্তম! ফাংশন জমিয়ে দিয়েছিলি—আমরা কিছুই জানতে পারি নি। শোনা শিগগীর ওই গানটা—আঃ কী গলা মাইরি তোর! কি করতে লেখাপড়া শিখছিস? গানের লাইনে যা। ভারত মাতাকে কাঁপিয়ে দিবি। সমর বলল—মেলা ভ্যাজর ভ্যাজর করিস না তো। বক্‌বক্ করা তোর স্বভাব। নে তবলায় আমি। বেঞ্চে বাজাবার জন্য সমর রেডি। ইতিমধ্যে সুদীপকে ঘিরে ছেলেদের বৃ্যহ। সুদীপের কালো মুখে সাদা হাসি। সে বলল

—তোরা বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি করছিস।

রমেশ আমাকে দেখে ফুট্ কাটলো—তুমি চাঁদু এখানে কেন? যাও বাইরে গিয়ে বইমুখে বসে পড়।

চোখ বুজে গান ধরেছে সুদীপ—রানার চলেছে তাই ঝুম্‌ঝুম্ ঘণ্টা বাজছে রাতে/রানার...

এতটা ভাবি নি। মনে হল হেমন্তর গলাকেও বুঝি হার মানিয়েছে। সূঁচ পড়লে শব্দ শোনা যাবে ক্লাসরুমের এমনি অবস্থা। একটার পর একটা। গান গেয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে সুদীপ।

সেই মুহূর্ত থেকে আমি সুদীপের ফ্যান। ছুটির পর রাস্তায় ধরলাম ওকে। —দারুন গান শোনালি। কার কাছে শিখছিস? ওর মুখের ম্লানভাব আমার দৃষ্টি এড়াল না। বলল ও—কারো কাছে না। নিজে নিজেই প্র্যাক্টিস করি। রেকর্ড শুনে গান তুলি।

—বাবাকে বল। ট্যালেন্ট নস্ট করিস না।

—কি যে বলিস। গানের ওপর বাবার প্রচণ্ড রাগ। বলেন লাফাঙ্গারা গান গেয়ে বেড়ায়। ফাংশনে গান গেয়েছি শুনে বাবা আমাকে দু'দুটো থাপ্পর উপহার দিয়েছেন।

হেসে বললাম—বাবা তোর পুলিশ অফিসার নাকি?

—নাঃ রাইটার্সে গেজেটেড অফিসার।

মৃদু ধাক্কা খেলাম। অহেতুক তুলনা। বাবা আমার ছা'পোষা কেরানি। এই যে শুরু হল—লেগে থাকল বন্ধুত্ব। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ায় সুদীপ যে গর্বিত সেটা ভালই বুঝলাম। কেরানিবাপের পুত্র হওয়ার দুর্বলতা কেটে গেল। সুদীপের বাড়ি গেলাম। সেও এল আমাদের বাড়ি। মা ওর গলায় ধনঞ্জয় পান্নালালের গাওয়া ভক্তিগীতি শুনতেন।

ম্যাট্রিকে মাত্র ক'টা নম্বরের কমতিতে দশের মধ্যে পৌঁছতে পারলাম না। তা সত্ত্বেও আমাকে নিয়ে বেশ ভালই হৈ হৈ হল। অনেক প্রাইজ, শিক্ষকদের অকুণ্ঠ প্রশংসার সঙ্গে দশের ভেতর আসতে না পারার অনুতাপ—বাবা মা ভাইবোনের আনন্দ জীবনকে ঝট্ করে কোথায় যেন উড়িয়ে নিয়ে চলল। আই এস সিতে স্ট্যান্ড না করলেও তেমন দুঃখ হল না। কেননা আই আই টি'র এনট্রান্স পরীক্ষায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে মেক্যানিক্যালে ভর্তি হয়ে গেলাম। সোমনাথ চান্স পেল এবং আমার সহপাটি হল। সুদীপ ফিজিক্স এ অনার্স নিয়ে বি. এস. সি পড়তে শুরু করল।

ছেলেবেলা থেকে সবার সপ্রশংস উক্তি বাস্তব পৃথিবী থেকে আমাকে অনেকটা উঁচুতে তুলে দিয়েছিল। এঞ্জিনীয়ারিং এ ফাইনাল পরীক্ষার আগে বাবার মৃত্যুতে বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে দারুন ঠোক্কর খেলাম। অবস্থা আমাদের এত জরাজীর্ণ তা জানা ছিল না। ধারদেনায় জর্জরিত মা'র উদভ্রান্ত দৃষ্টি ভাইবোনের অসহায়তা অসম্ভব বিচলিত করলে আমাকে। বুঝলাম সংসারের পুরো দায়িত্ব এখন আমার পিঠে। বিদেশ যাত্রার ইচ্ছে স্থগিত রাখতে হল। সংসারকে স্বাচ্ছল্যে ভরিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা এল মনে।

সে সময় কলেজে গোনাগুনতি মেয়ে। তবু এদের মধ্যে দু' একজন আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। হয়ত মেধাবী এবং দেখতেও মন্দ নই বলে। প্রেমে পড়া সম্ভব হয় নি। মনের ঘরে সংগোপনে রাখা সেই ছবিটি সামনে এসে সব ভেস্তে দিত। যাইহোক ফাইনাল পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে সোনার মেডেল হস্তগত হল। ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়ে বিদেশী ফার্মে একটি জবরদস্ত চাকরি জুটে গেল। প্রথম মাসে মাইনের কড়কড়ে নোটগুলো হাতে দিতে মা'র ফুঁপিয়ে ওঠা কান্নার দৃশ্য আজও আমার মনে স্থিরচিত্র হয়ে আছে। সংসারের পরিবর্তন হঠাৎ হঠাৎ চোখে

পড়ে যায়। সুজয় মানে আমার ছোটভাই আর মা মিলে আমাদের ঘুপচি ভাড়াবাড়ি বদল করে চারকামড়ার বড়সড় বাড়িটা কবে সাজিয়ে ফেলেছে—ঠিক করে যেন বুঝে উঠতে পারলাম না। ছোট বোন নীলিমা তার শুকনো ক্ষয়াটে চেহারা কোথায় ফেলে এসেছে। উজ্জ্বল শ্রীময়ী হাসিখুশী চেহারার তরুণী এখন সে। ভাই সুজয়কে দেখলে কোন বড়ঘরের ছেলে বলে ভ্রম হয়। নিয়মিত ডাম্বেল মুগুর ভেঁজে শরীরকে সতেজ স্বাস্থ্যবান করে তুলেছে। কোন কিছু বলতে গেলে সে দাদা বলে এমন শ্রদ্ধার ভাব দেখিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যে আমার লজ্জাবোধ হয়। সুখ ও নিশিচিন্ততা দেবার জন্য ওরা যে আমাকে ভগবানের আসনে বসিয়েছে তা বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না।

জীবন আমার এক্সপ্রেস ট্রেনের মত দ্রুতগতি লাভ করল। বাড়ির তিনজন কেউ আমাকে সংসারের কাজের জন্য বিরক্ত করে না। অফিসের চাপ প্রবল। যখন তখন বম্বে দিল্লী যেতে হয়। মাঝে একবার মাসদুয়েকের জন্য লন্ডন ঘুরে এলাম। কলেজ ছাড়বার পর দীর্ঘ এতগুলো বছরের মধ্যে সুদীপের সঙ্গে বেশ ক'বার দেখা হয়েছে। সুদীপ গায়ক হয় নি। অধ্যাপনার কাজে যোগ দিয়েছে। ওর সম্বন্ধে আমি যত না জানতাম আমার সম্বন্ধে ওর দারুন আগ্রহ ছিল তা ওর সঙ্গে দেখা হলেই উপলব্ধি হত। একদিন প্রাচীর সামনে দেখা হতে সুদীপ বলেছিল—বস্ দিব্যি লন্ডন ঘুরে এলি। হিল্লী দিল্লী ঘুরছিস অনবরত। দেখালি বটে। আর আমি? ছাত্র ঠেঙ্গিয়ে বেড়াচ্ছি।

—অধ্যাপনার কাজের মত সম্মানের কাজ আর আছে নাকিরে?

—রাখ রাখ। দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ছি সরকারের খেয়াল আছে? অধ্যাপকদের মাইনে কত জানিস? সংসার চালাব কি করে?

—কেন বিয়ে করেছিস নাকি? ঠাট্টার সুরে বললাম আমি।

—ধুস আমাকে কে মেয়ে দেবে? কালো বেটে মোটা। হা হা করে প্রাণখোলা হাসি হাসল সুদীপ। লক্ষ করে দেখলাম হাসলে ওকে খুব মিষ্টি দেখায়।

—গানের লাইনে না গিয়ে মনে হয় ভুল করেছিস।

—ভাগ্য। ভাগ্য সহায় না হলে কিস্যু হয় না।

এরপর বছর খানেক বাদে হঠাৎ এক রবিবার জোর বেল বাজতে দরজা খুলে দেখি সুদীপ দাঁড়িয়ে। একমুখ হাসি। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ। বলল—যাক বস্ তোমার দেখা পাব আশাও করি নি।

—কি ব্যাপার? আয় আয় বোস।

—উঁহুঃ বেশীক্ষণ বসব না। একটা দরকারে...

—বলে ফ্যাল।

সুদীপ চুপ। মুখ নিচু। ভাবলাম কোন ব্যাপারে হয়ত আমার পরামর্শ বা সাহায্য চাইতে এসেছে।

ভরসা দিয়ে বললাম—যা বলার বলে ফ্যাল না।

বলছি—বলে সুদীপ ব্যাগের ভেতর হাত চালিয়ে প্রজাপতি আঁকা লম্বা খাম বের করল। চোখ তুলে বলল—সাতপাকে বাঁধা পড়তে যাচ্ছি।

চেঁচিয়ে উঠলাম—বাব্বাঃ ভড়কে দিয়েছিলি। তা কবে ছাদনাতলায় যাচ্ছিস?

—বারই ডিসেম্বর। চোদ্দই বৌভাত, দু' অনুষ্ঠানেই তোর থাকতে হবে।

—বিশ্বাস কর সুদীপ। এগারোই দিল্লী যাচ্ছি। খুব জরুরী মিটিং ফিরব পনেরোই। বিয়ে বৌভাত কোনটাতেই থাকতে পারব না। কালো মুখের সুদীপকে আরও কালো দেখাল। খানিকটা যেন আশাহত। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—জানতাম। আরে ভাই, বিখ্যাত লোকদের সময় নিয়ে বড্ড টানাটানি।

—খুব দুঃখিত। কথা দিচ্ছি ফিরে এসেই তোর বাড়িতে যাব। দু'দিনের খাওয়া একসঙ্গে খেয়ে আসব। —টাকা রোজগার করি বটে তবে তার হ্যাঁপা অনেক।

সুদীপদের বাড়ি উত্তর কোলকাতায়। এক তস্য গলির ভেতর। বাড়িটা অবশ্য ভাল। সামনে সেকেলে ধাঁচের জালিকাটা বারান্দা। বড় বড় ঘর। মাঝে উঠোন। অনেকবার গেছি ওদের বাড়িতে। দিল্লী থেকে সকালের ফ্লাইটে এসেই সুদীপের বাড়ি যাবার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। সত্যি বলতে কি বিয়েতে উপস্থিত না হতে পেরে কিছুটা বিবেকদংশনে ভুগছিলাম। মধ্যবিত্ত মানসিকতার দরুনই বোধহয় ট্যাক্সি নিলাম না। অফিসটাইমে বাসের ভীড়ে শীতেও গরম লাগছিল—চুল এলোমেলো। বাস থেকে নেমে পকেট-চিরুনী বার করে চুল আঁচড়ে নিলাম। বাড়ির সামনের বারান্দায় বিভিন্ন আকারের ঝুড়ি। কড়া, গামলা বড় বড় হাতাখুন্তীতে বোঝাই। দু'চারজন অচেনা লোক ঘুরঘুর করছে। বাইরের দরজা হাট করে খোলা। তা সত্ত্বেও বেল বাজালাম। সুদীপই এল। পরনে কোঁচানো ধুতি। গায়ে হাতকাটা গেঞ্জী। ভীষণ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল ওকে। একমুখ হাসি নিয়ে বলল—কাজ মিটল? আজ আর তোকে ছাড়ছি না। সমর, দীপ্তেশ, সুনীল, সোমনাথ সবাই এসেছিল। দারুন মজা করেছে ওরা।

বিয়েবাড়ি স্পেশাল গন্ধ চারপাশে। ফুল সেন্ট মিষ্টি লুচির একটা মিশ্রিত গন্ধ নাকে ঝাঁপটা মারল। একরাশ ফুলের তোড়া পড়ে আছে মেঝেতে। ক্ষুদে ক্ষুদে মৌমাছি ঘুরছে স্তবকের চারপাশে।

বললাম—আমার আগেই মেরে বেরিয়ে গেলি। গিন্নীকে ডাক। দেখি কেমন পেলি?

—একদম বাজে। তোর মত ভি আই পি দের পছন্দ হবে না। তবে সামনে আবার মুখ ফস্‌কে কিছু বলে ফেলিস না।

সুদীপ ভেতরে গেল বোধ হয় বৌকে ডাকতে। আমি দিল্লীর সদ্যসমাপ্ত মিটিং এর কথা ভাবছিলাম। ব্যানার্জী ব্যাটা আমাকে ল্যাং মারবার চেষ্টায় আছে। ওকে কি ভাবে টিট করা যায় সেই চিন্তায় ব্যস্ত ছিলাম। এমন সময় সুদীপ বলল—কি এত ভাবছিস?

তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে বলল—মাধু এর কথাই তোমাকে বলছিলাম। দারুন ব্রিলিয়ান্ট। আমাদের গর্ব অর্ক।

সুদীপের বৌ এর দিকে তাকিয়ে ধাঁধা লেগে গেল। মুহূর্তের জন্য মনে হল আমার হার্ট আর বীট করছে না। অসম্ভব আশ্চর্য লাগছিল। আমার মনের গভীর গহন কোণে আঁকা ছবির জীবন্ত সংস্করণ ও পেল কোত্থেকে? কে জানে কেন হাত পা সর্বশরীর অবশ হয়ে এল। হাতে ধরা শাড়ির প্যাকেটটা একারণেই বোধহয় শব্দ করে পড়ে গেল মেঝেতে। স্তব্ধতার হাত থেকে বাঁচলাম। প্যাকেটটা উঠিয়ে নিলাম।

—কি রে চুপ মেরে গেলি কেন?

ঢোক গিলে কোন মতে বললাম—আসলে ওনাকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

চোখ নাচাল সুদীপ—মাধু এসব কি শুনছি? অর্কর সঙ্গে তোমার বুঝি আলাপ ছিল?

শোন অর্ক—আমার চোখে চোখ রাখল সুদীপ—ওকে ওনাকে উনি এসব বলতে হবে না। আমাদের থেকে বেশ ক'বছরের জুনিয়ার ও।

কথা শুনে হেসে ফেলল মাধবী। দেখলাম কুন্দশুভ্র সাজানো দাঁতের ঝিলিক। চোখ ফেরাতে পারছি না। ঘোমটা পড়ে গেছে। অনভ্যাসে হয়ত। দেখছি ওর পিঠে ছড়িয়ে থাকা একরাশ রেশমী চুল। টানা টানা চোখে অপার রহস্য। সেই দীপ্ত ভঙ্গী লম্বা টান চেহারা। স্বপ্নে ও বাস্তবে এত মিল!

—নে বল কিছু। স্মার্ট বয় ঘাবড়ে গেছিস মনে হচ্ছে। বুকের ভেতর অব্যক্ত বেদনার এক অদ্ভুত আলোড়নে বিদ্ধস্ত হতে হতে আমি বলে উঠলাম—দারুন!

তারপর কোনক্রমে কাঁপাহাতে শাড়ির প্যাকেটটা ওর স্ত্রীর হাতে ধরিয়ে দিলাম।

সুদীপের জবরদস্তিতে একটা মিষ্টি গলাধঃকরণ করে বললাম—ভোরের ফ্লাইটে এসেছি। শরীরটা খুব খারাপ লাগছে। আজ চলি। আসব পরে।

—সে হবে না। বিয়েবাড়ি এসে না খেয়ে যাবি?

সুদীপের সমস্ত অনুরোধ ঠেলে রাস্তায় বেরোলাম। স্বীকার করতে লজ্জা নেই এতদিনের স্বপ্নের ছবি মুছে গেল। রক্তমাংসের মাধবী পেয়ে বসল আমাকে।

একেই কি প্রেম বলে? জানি না। কিছুতেই কোন উপায়েই মাধবীকে পাওয়া সম্ভব নয় সে জ্ঞান আমার ছিল। কিন্তু এই অসম্ভব মোহ থেকে নিজেকে কিভাবে মুক্ত করা যাবে ভেবে দিশেহারা হয়ে গেলাম। কাজ থাকলে এককথা কিন্তু অবসরে এক পলকের জন্যও তাকে চোখের আড়াল করতে পারছি না। আমার গ্রাম্য মা'র চোখে আমার পরিবর্তন ধরা পড়ল।

—আকু তর কি হইছে ক'দেখি।

—কিচ্ছু হয় নি।

মা ভুরু কোঁচকালেন—কি অফিসে কুন গণ্ডগোল?

—না মা কোথাও কোন গণ্ডগোল হয় নি।

মা প্রসঙ্গান্তরে গেলেন—এত মাইয়া দেখলি। তর আর পছন্দ হয় না। কি চাস বলত? বিয়া করবি কি করবি না কইয়া দে।

বাড়ির প্রত্যেককে ভাবিয়ে তুলেছি। মা'র তাড়নায় একে একে দশটি মেয়ে দেখেছি। না—আমার কল্পনার ধারে কাছেও নয় তারা। অতুলনীয়া সুন্দরী বলে যাকে দেখে এসেছি তার চেহারায় সৌন্দর্যের ছিঁটেফোটাও নেই। কেউ বেঁটে কেউ মোটা কেউ এত রোগা যে ফুঁ দিলে উড়ে যাবে মনে হয়েছে। এই দশ দশটি মেয়ের মধ্যে কারো চোখই কথা বলে নি। সবার চোখে উদ্বেগ। পাত্র পছন্দ করবে কি করবে না সেই ভাবনা লেখা রয়েছে যেন। পাত্র হিসেবে আমার দাম তারা জানে বলেই হয়ত এই দুশ্চিন্তা।

হতাশার শেষে প্রান্তে এসে আমার মানসপ্রতিমার দেখা পেলাম। তাও পরস্ত্রীরূপে। একটা অদ্ভুত ঈর্ষা আমাকে কুড়ে কুড়ে খেতে থাকল। সুদীপ, যে আমার তুলনায় অনেক নীরস সে, এভাবে টপকে গেল আমাকে !

মা বললেন—উত্তর দে। তর এই জিদ আর আমার ভাল লাগতাসে না।

—ঠিক আছে। মেয়ে দেখো তুমি।

আচম্‌কা আমার মনে হয়েছিল বিয়ে করলে এ মনোবিকার দূর হয়ে যাবে। মানুষের জৈবক্ষুধা থেকে এমন মনোবিকার হতেই পারে। উপলব্ধি করেছিলাম এমন অশান্তি বয়ে বেড়ালে নিজের ক্ষতি কেরিয়ারের ক্ষতি। একদিন রাত্রে ভাতের থালা এগিয়ে দিয়ে মা বললেন—শনিবার বিকালে কোন কাজ রাখবি না কইলাম। আমার লগে মেয়ে দেখতে যাবি।

—তোমরা যাও। আমি যাব না।

—না দেইখ্যা বিয়া করবি?

—তোমরা তো দেখে এসো। তারপর দেখা যাবে। পাত্রী দেখে এসে মা বললেন—ফুইটফুইট্যা পরী যেনি। যারে আকু দেইখ্যা আয়। এবারে তর পছন্দ হইবই।

নীলিমার মুখভর্তি হাসি। বলেছিল—কি ফর্সারে দাদা। নীলরঙের শাড়িতে দারুণ লাগছিল।

শুধু সুজয় বলেছিল—চলবে।

অনেকরকম ভাবনাচিন্তার শেষে স্থির করলাম মেয়ে না দেখেই বিয়ে করব। সত্যি কথা বলতে কি নিজের ওপর ভরসা রাখতে পারি নি। দেখামাত্র অপছন্দ হবে এ যেন ধরেই নিয়েছিলাম। ফটো একখানা দেখেছিলাম বটে—তেমন করে কিছু বুঝতে পারি নি। আসলে ভবিতব্যকে মেনে নিয়েছিলাম। মেয়ের বাড়ির অবস্থা ভাল, না চাইতেই অনেক কিছু দিচ্ছে তারা। বাড়িতে মা ভাইবোনের অতিউৎসাহ টের পাচ্ছি। আপ্রাণ চেষ্টা করছি মাধবীকে ভুলতে। আমার বিয়েতে তার উপস্থিতি কিভাবে সহ্য করব ভাবছিলাম। ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। সে সময় ওরা কাশ্মীর ভ্রমণে বেড়িয়েছিল।

ফুলে মোড়া গাড়ি, আলোয় ঘেরা বিয়ে বাড়ি, বিশাল ম্যারাপ, লোকজনের হট্টগোল, সানাইএর মূর্ছনা—এত সবকিছুর ভেতর বরবেশে ঘোরলাগা স্বাভাবিক। কিছু সময়ের জন্য কি ভুলে ছিলাম মাধবীকে? হয়তবা। সামান্য আশার আলো দুলিয়ে দিচ্ছিল মনকে। পরীর মত মিষ্টি মেয়ে আমার মনোবিকার দূর করে দেবে এধরনের চিন্তায় নিজেকে উদ্বুদ্ধ করতে চাইছিলাম। নানা আচারবিচারের পর শুভদৃষ্টির শুভলগ্নটি এসে গেল। মাথার ওপর চাদর ফেলবার পর এই প্রথম আমি নন্দিনীর দিকে তাকালাম। তাকিয়েই থাকলাম। চারদিক থেকে হাসিমস্করার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। নামা রে ব্যাটা চোখ নামা। লজ্জা নেই নাকি? কেউ একজন ছড়া কাটল। রণেনই হবে।—সারাজীবন রইল পড়ে। তখন দেখিস হাঁ করে।

রাগে আমার হৃদপিণ্ড লাফাচ্ছিল। দেখছি আর ভাবছি। বিশাল চওড়া দীপ্তিহীন মুখ, বুদ্ধিহীন চোখ, ফ্যাকাসে রঙ—এ হল গিয়ে পরীর মত ফুইট্‌ফুইট্যা। বুঝতে পারলাম কতটা ভুল করেছি। হাত পা বাঁধা এখন। মনের বাঁধনে বাঁধতেই হবে একে।

ফুলশয্যার রাতে ওর বিশ্রী ফিগার নজরে পড়ল। চওড়া কোমর মোটা মোটা হাত পেছন চ্যাপ্টা, শ্রীহীন একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। পাঁচ পাঁচটা বছর নন্দিনী কোন জ্বালাতন করে নি। আমাদের শান্তির সংসারে একটি আঁচড়ও কাটে নি সে। নম্র ভদ্র শান্ত। তবে বোধহীন। আমি অর্ক বোস ওকে ভালবাসতে পারছি না—সেটা বোঝবার মত ক্ষমতা ওর ছিল না। না—চেষ্টা করেও মোহ জাগাতে পারে নি। ওর ভাষাহীন চোখে কোন রসের সন্ধান পাই নি। সকালে ঠিক সময়ে বেডটি দিয়ে বলত—এই যে তোমার চা।

লাঞ্চ অফিসে। ডিনারে মা'র সঙ্গে সঙ্গে আমার খাওয়ার তদারক করত। আমার সব আদর মাধবী পেত সেকথা জানবার অবশ্য কোন উপায় ছিল না তার। পাঁচবছরের মাথায় নন্দিনীর ফ্যাকাসে রঙ কালো হতে শুরু করল। মা ব্যস্ত হলেন। একদিন মাথা ঘুড়ে পড়ে গেল সে—আশার আলো জ্বালিয়ে। পরীক্ষানিরীক্ষাতে ধরা পড়ল—না পেটে বাচ্চা আসে নি—প্রেসার লো হয়েছে। আমার জীবনতরী এখন জেটগতিতে ছুটছে। ঘরে মন নেই। মনকে সম্পূর্ণভাবে কেরিয়ার তৈরির খাঁচাতে ঢেলে দিয়েছি। কোন মিটিং বা কনফারেন্স থাকলে দারুন আনন্দ অনুভব করি। প্রোডাকসন কত, সেল কত হচ্ছে মোটকথা কোম্পানির লাভ ক্ষতি উন্নতি অবনতি আমার মাথায় ঘুনপোকার মত ঘুরঘুর করছে। সিঁড়ি টপকাবার নেশা আমাকে পেয়ে বসেছে। মাঝে মাঝেই ভুল হয়ে যায় যে আমি বিবাহিত।

তা'বলে নন্দিনীর চিকিৎসার কোন ত্রুটি রাখি নি। ছোট বড় মেজ সবরকম ডাক্তার দেখানো হয়েছে। মা, সুজয়, নীলিমা তার শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে নন্দিনীকে আগলে রাখছে। অসুখটা যে কী কিছুতেই ধরা পড়ছে না। মা বললেন—আকু এইবার তুই ছুটি নে। বৌ মরত্যাসে অসুখের জ্বালায়—হিল্লী দিল্লী কইর‍্যা বেরাইতেছস্ কুন প্রাণে?

ছুটি নিলাম। জলের মত অর্থব্যয় করছি। চিরকাল আমার কর্তব্য অত্যন্ত প্রখর। তাছাড়া নন্দিনী এতদিনে একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। বুকের কোথায় যেন ব্যথার ঢেউ। কিছুতেই কিছু করা গেল না। উড্‌ল্যান্ড নার্সিং হোমে পাঁচবছরের ঘরসংসার ফেলে একদিন ভোরের সূর্যের নরম আলো গায়ে মেখে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করল সে।

শোক হয় নি বললে মিথ্যে বলা হবে। বড় শূন্যতা ঘিরে রেখেছিল আমাকে। বিছানায়, চায়ের কাপ হাতে, রাত্রে খাবার তদারকিতে মাঝে মাঝেই নন্দিনী সামনে এসে যেত। চমক লাগত। বুঝতাম হ্যালিউসিনেসনে ভুগছি। ধীরে খুব ধীরে নন্দিনীর ছবি মুছে গেল। বুকের লুকোন ঘরে মাধবীর ছবি নড়েচড়ে উঠে বসল।

যা স্বাভাবিক। আমার ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। মাস কয় যেতে না যেতেই মা আবার আমার বিয়ের জন্য কান্নাকাটি জুড়ে দিলেন। অফিসের লোক, দুরাত্মীয়, ঘটক সবার আনাগোনায় বাড়ি একেবারে সরগরম হয়ে উঠল। পাত্র হিসেবে আমার দাম এখনও ফার্স্ট গ্রেডে এটা তো ঠিক। মাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম পৃথিবীর কারো সাধ্য নেই আমাকে আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসাবার। বললাম—সুজয়ের বিয়ে দিয়ে মনের সাধ মেটাও।

মা আশা ছাড়লেন। মাসকয়েকের ভেতর সুজয়ের বিয়ে হয়ে গেল। আর এক বিদেশী ফার্মে আরও উঁচু পোস্টে জয়েন করলাম। এবার চাঁটিবাটি গুটিয়ে চাকরিস্থল দিল্লীতে ডেরা বাঁধলাম। কিছুদিনের মধ্যেই চাকরিজীবনে মজে গেলাম। এদেশ বিদেশ স্কচ হুইস্কির ফোয়ারায় জীবনটা রঙ্গীন হয়ে উঠেছে। সাফল্যের গর্বে জীবনের সাদা ভাবটা কেটেই গেছে। এভাবেই সময়ের চাকা ঘুরতে ঘুরতে কখন চেয়ার ছাড়বার সময় এসে গেল। আর ঠিক সেসময় সুদীপের মৃত্যুখবরে জীবনের ছকটা ভয়ানকভাবে নাড়া খেয়ে উঠল।

বাজার সেরে বাড়ি ফিরতে মা চা নিয়ে এলেন। এখনও নিজে হাতে চা করেন। তাকালাম তার দিকে। আটাত্তর বছর বয়সেও কী জীবনী শক্তি! কী মননক্ষমতা! অদ্ভুতভাবে টের পেয়ে যান আমার মনের অস্থিরতা। চা দিতে দিতে বললেন—আকু তর মুখ শুকনা দেখায় ক্যান রে?

—সুদীপকে মনে আছে? সে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে।

—আহা গো। বড় হাসিখুশী পোলা ছিল। কী সুন্দর গান করত। আমারে কতবার ভক্তিগীত শুনাইছে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে মা'র আলাপবিলাপ চলল। সোচ্চারে। নীরবে আমার মনের ভেতরও উথালপাথাল। স্মৃতিগুলো ভয়ানকভাবে ধাক্কা দিচ্ছে। লাস্ট বোধহয় সুদীপকে বছর দশেক আগে দেখেছিলাম। অধ্যাপনায় যুক্ত থাকতে থাকতে চেহারায় একটা মাস্টারিসুলভ ছাপ। ব্যবহারে সেই আগের সুদীপ। বলেছিল—কি রে তুই হঠাৎ মাটিতে? শুনেছি সর্বদা অর্কসাহেব আকাশে থাকেন।

এতবছরের ভেতর মাধবীকে দেখেছি বোধহয় বারপাঁচেক। বছর কুড়ি আগে শেষবার দেখেছি। সেবার আচমকা এক রবিবারে সুদীপ জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে। ফুটফুটে ফর্সা সুদীপের মেয়ে। ঘরের ভেতর ঘুরঘুর করছিল। অনেকটা মা'র মত দেখতে। মাধবীর পরনে ছিল নেভীব্লু রঙের শাড়ি। আমি যেন কত পরিচিত তার—এভাবেই সে লুচি তরকারি মিষ্টি ভর্তি থালা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। আপত্তি করাতে বলে উঠেছিল—আপনার তো দেখাই পাওয়া যায় না। অ্যাদ্দিনবাদে এলেন। খান না অর্কদা।

মধুঝড়া গলা। তাকিয়ে চোখ আটকে যাচ্ছিল। জোর করে চোখ ফিরিয়ে রাখা যে কী কষ্টকর সেদিন তা বুঝেছিলাম। মনে মনে ভাবছিলাম কী আভিজাত্য মাধবীর চেহারায়। কী বুদ্ধিদীপ্ত চোখ!

সুদীপ বলল—যাক্ তোর অনারে লুচি মিলল। রাঁধবে কখন? যা বই পড়ার নেশা। আমি অধ্যাপক বলে নাকি ও এবিয়েতে রাজী হয়েছিল। এই ধারনায় যে পরমসুখে বইমাথায় ও ঘুমোতে পারবে।

সুদীপ ওর স্বভাবসিদ্ধ খোলা হাসিতে ঘর ভরিয়ে দিয়েছিল। সঙ্গে জলতরঙ্গের শব্দতুলে হাসতে হাসতে মাধবী বলেছিল—ওর একটা কথাও বিশ্বাস করবেন না অর্কদা।

কে জানে কেন মাধবীর উপস্থিতি আমার পক্ষে স্বস্তিজনক ছিল না। তার সঙ্গে পাছে দেখা হয়ে যায় এধরনের একটা ভীতিবোধ ছিল আমার। ঠিক একারণেই সুদীপের সঙ্গে মেলামেশা আমি প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলাম। মাধবীকে দেখার পর প্রায় দিনসাতেক ধরে রি-অ্যাক্‌শন চলত। খুব ডিসটারবড্ ফিল করতাম।

সুদীপের কারণে মন ভারাক্রান্ত কিন্তু কে যেন কানের কাছে অনবরত বলে চলেছে মাধবী একা। চিন্তা করতে করতে নিজেকে একসময় বোকা এবং পাগল মনে হল। সুদীর্ঘবছর কেটে যাবার পর আমার মানস প্রতিমা কি একইরকম আছে? থাকা সম্ভব? এতগুলো শীতবসন্ত বর্ষা ওর উপর দিয়ে বয়ে যায় নি? তার সামনের দাঁত পড়ে যেতে পারে—চুল উঠে যেতে পারে। পেকে সাদা হয়ে যেতে পারে কিংবা মোটাসোটা গিন্নীবান্নী মাধুকে কি সহ্য করা সম্ভব? শুধু শুধু স্বপ্নভঙ্গ করে কি লাভ? তাও এই বয়সে? কোন নেগেটিভ চিন্তাতেই কোন কাজ হল না। মন আমার বশ নয় আমি মনের বশ হয়ে গেলাম। দিল্লীর পাট উঠিয়ে কোলকাতায় ফিরে এসেছি। গুছিয়ে বসতে না বসতেই দীপ্তেশের বাড়ি গেলাম। সুদীপদের খুঁটিনাটি সব খবর সংগ্রহ করলাম। সুদীপের বাবা মা মারা গেছেন। ওদের সাতপুরোন ভাড়াবাড়ি আর নেই। সুদীপ অনেকদিন আগে থেকেই ছাত্র পড়িয়ে প্রচুর রোজগার করেছে। মধ্য কোলকাতায় একটি ছিমছাম ফ্ল্যাট কিনেছে সে। সুদীপ বেঁচে থাকতেই তার সুন্দরী মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। সে থাকে আমেরিকায়। ফ্ল্যাটের ঠিকানা ফোন নাম্বার সব নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ প্রচণ্ড অস্থিরতা নিয়ে মাধবীর ফ্ল্যাটের খোঁজে বেরোলাম। কোলকাতার ছেলে আমি। বেশীক্ষণ সময় লাগল না। কিছুক্ষণ পর সুদীপ মিত্রর নেমপ্লেট লাগানো দরজার সামনে হাজির হোলাম। বিদেশ ঘোরা আই আই টির এঞ্জিনীয়ার তাবড় তাবড় লোকের সঙ্গে ওঠা বসা সেই আমি ডিসেম্বরের শীতে ছায়া ঢাকা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘামছি এবং কাঁপছি। ডোরবেলে হাত দিতেই পিয়ানো বাজার শব্দ কানে এল। দরজা খুলে দাঁড়িয়ে মাধবী। হাসল। বিষণ্ন হাসি। দেখলাম চমৎকার সাজানো দাঁতের ঝিলিক্। বলল সে—আসুন অর্কদা। জানতাম আমি আপনি নিশ্চয় আসবেন। আপনার বন্ধু থাকলে কী খুশীই না হতেন।

—খুব দুঃখের কথা। ও যে এত তাড়াতড়ি চলে যাবে ভাবতেও পারি নি।

—ভাগ্য অর্কদা। ভাগ্য।—বড়সড় শ্বাস ফেলল মাধবী।

—আমার কথা চিন্তা করুন। মোটে পাঁচবছরের মাথায় পার্টনার হারিয়েছি।

প্রথম সাক্ষাতে এসব দুঃখজনক কথার মাঝে আমি প্রাণভরে মাধবীকে দেখছিলাম। মনে মনে তারিফ করে যাচ্ছি। কণ্ঠস্বর তেমনি মধুঝরা। মুখ ঘিরে স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতা। টক্‌টকে রঙ কিছুটা মলিন। চুলে কি কলপ দিয়েছে? বিশ্বাস হল না! রেশমী কালো চুলে বিশাল এলো খোঁপা। চা খাবার অনুরোধ জানিয়ে মাধবী উঠে দাঁড়ালো। অল্প বয়সের পাতলা শরীর কিঞ্চিৎ ভারী হয়ে আরও সুসমঞ্জস রূপ নিয়েছে। এখনও কী চমৎকার ফিগার! লম্বা টানা চেহারা। অধিকাংশ বাঙ্গালী গৃহবধূর মত পেট কোমরের বৃদ্ধি সে কিভাবে ঠেকিয়ে রেখেছে কে জানে!

সে আর অল্পবয়সী যুবতী নয়। বয়সের ছাপ আবশ্যই পড়েছে। তবু এই বয়সেও সব মিলিয়ে তার সৌন্দর্যের বিকীরণ আমাকে মুগ্ধ করে ফেলল। তাকে নিয়ে যে দুঃস্বপ্ন আমাকে তাড়া করেছিল তা চুরচুর হয়ে যেতে খুশী আর স্বস্তিতে মন ভরে উঠল।

উঠতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু প্রথমদিনই বেশী সময় বসে থাকাটা ঠিক হবে না। চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে বললাম—আজ উঠি। যে কোন দরকার বা অসুবিধেয় পড়লে আমাকে খবর দিতে দ্বিধা করবেন না। ও হ্যাঁ আমার ফোন নাম্বরটা নিয়ে নিন।

—আবার আসবেন অর্কদা। খুব ভাল লাগল। আপনি কিন্তু আমাদের খোঁজখবর মোটেই নিতেন না। এনিয়ে আপনার বন্ধুর মনে খুব দুঃখ ছিল। বলতেন নামী দামী হয়ে অর্কর খুব অহঙ্কার হয়েছে। ও আমাদের ভুলে গেছে। কেন মিশতাম না—সুদীপ বেচারা জানবে কি ভাবে?

বললাম—এবার থেকে এত আসতে শুরু করব যে তাড়াতে পারলে বেঁচে যাবেন।

সময় হিসেব করে মেপে জুপে মাস দুই এর মধ্যে চার পাঁচবার আসা হয়ে গেল আমার। মাধবীর সঙ্গে সময় কাটানো কোন ব্যাপারই নয়। রাজনীতি সামাজিক সমস্যা ভাল টি ভি সিরিয়াল নাটক সিনেমা সর্বত্র তার অবাধ গতি। পর্দা সরে গেছে। বাইরের ঘরে বসে শোবার ঘরে টেবিলের ওপর স্তূপাকৃত বইপত্তর দেখে জিজ্ঞেস করলাম—আবার কি পড়াশোনা শুরু করেছেন?

—কই আর পারলাম? আসলে বই পড়া আমার নেশা। সংসারে ডুবে পড়া ছেড়ে দিয়ে খুব ভুল করেছি। মাধবীর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম।

একদিন মনের কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল অজান্তে।—আপনি কিন্তু এখনও অসম্ভব সুন্দর রেখেছেন নিজেকে। সে বলল—ধ্যুর এ বয়সে আবার সুন্দর অসুন্দর! চা খাবেন অর্কদা?

কথা ঘোরালো সে বুঝতে পেরেছিলাম।

আর একদিন প্লেটে সন্দেশ রসগোল্লা দেখে বলে উঠেছিলাম—করেছেন কি? অসময়ে চারটে মিষ্টি কি খাওয়া যায়? তুলে রাখুন।

—খান না অর্কদা। চেনা মিষ্টিওয়ালা জোর করে দিয়ে গেছে। খুব ভাল মিষ্টি। খেয়ে দেখুন।

কাঙ্খিত সেই মানসপ্রতিমা আমার সামনে ঘুরছে ফিরছে খাবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে। বুদ্ হয়ে গেছিলাম। ভাবনা হচ্ছিল এ স্বপ্ন না এক টোকায় ভেঙ্গে যায়। আস্তে আস্তে অনুভব করলাম স্বপ্ন হয়ত বাস্তবরূপ পেতে চলেছে। মাধবীর স্বতঃস্ফূর্ত হাসির ভেতর অনেক না বলা কথার ইঙ্গিত পেলাম। সে কি সঙ্গীর অভাব ফীল করে না? হতেই পারে না। মনের ভাষা সে বুঝতে পারছে না এত বোকা সে নয়। বয়স কি মানুষের ভালবাসার সৌন্দর্য কেড়ে নিতে পারে? অনেক প্রশ্নোত্তরের ঝড় বুকের ভেতর। ধৈর্য রাখা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। দিনরাত রিহার্সাল চালাচ্ছি। কী ভাবে কী ভাষায় তাকে কী বলব। ভগবান মানি না অথচ এ'কদিন একমনে ভগবানকে ডাকতে লাগলাম। শেষ জীবনের স্বপ্নকে সফল করবার প্রয়াসে।

দরজা খুলে—ও অর্কদা আপনি?—সেই মিষ্টি সুর। আজ মাধবীর পরনে হাল্কা গেরুয়া রঙের জড়িপাড় শাড়ি সঙ্গে ম্যাচিং ব্লাউজ। কপালে ছোট সাইজের কালো টিপ। সর্বদা ফিট্‌ফাট। পরিচ্ছন্নতা যেন মাধবীর সঙ্গী। ঢুকেই বললাম—ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছে আপনাকে।

হাসল মাধবী—রোজ কি অসুন্দর দেখায়?

—প্রতিমুহূর্তে আপনি অনবদ্য!

—তাই নাকি? এবার শব্দ তুলে হাসল মাধবী। সুবর্ণ সুযোগ। হাতছাড়া করা চলবে না। প্রস্তুতি নিতে গিয়ে মনে হল সমস্ত রক্ত মুখে জমা হচ্ছে। গলা শুকিয়ে আসছে। সব দ্বিধা প্রাণপণে ঠেলে বলে উঠলাম—মাধবী আজ আপনাকে কিছু খোলাখুলি কথা বলতে চাই। বলতে পারি?

—বলুন না।

—এতদিন কাজের ঘোরে লোল্‌নিনেস কাকে বলে সঠিক বুঝতে পারি নি। সময় কেটে গেছে। এখন যদিও বিভিন্ন কোম্পানিতে কন্‌সালটেন্সিতে যুক্ত আছি তবু বেশ খানিকটা সময় পাওয়া যাচ্ছে। এত ফাঁকা মনে হয় জীবনটাকে! ভীষণ ইচ্ছে হয় মনের মতো কারো সঙ্গে বাকি জীবন কাটাই। আপনার নিসঃঙ্গ লাগে না?

—লাগে বৈকি? কিন্তু জীবনের কঠিনতাই তো মেনে নিতে হবে অর্কদা! ভগবানের কাছ থেকে শুধু হাত পেতে সুখ নেব দুঃখ নেব না তা তো হয় না।

—কেন? এর মধ্যে কোন যুক্তি আছে নাকি? কঠিনকে সোজা করে তোলা মানুষের ধর্ম।

সামান্য সময় চুপ করে থেকে দুম্ করে বলে বসলাম—মাধবী, কান্ট উই মেক টুগেদার এ লাইফ?

মাধবী যেন প্রস্তুত ছিল। কারণ এরকম বিস্ফোরক কথা শোনবার পর তাকে বিচলিত বা বিস্মিত হতে দেখলাম না। খুব শান্ত ভাবে তাকাল আমার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বলল—আমরা মধ্যবিত্ত। সমাজের বাঁধন আমরাই ধরে রেখেছি। পয়সার অভাবে যারা ধুঁকছে আর পয়সার বোঝা যারা টানতে পারছে না—এই দুই সমাজের জন্য এসব নিয়ম।

বললাম আমি—কিন্তু পশ্চিম দেশ মানে ইওরোপ আমেরিকায় এসব নিয়ে তো কেউ মাথা ঘামায় না। আমাদের সমাজে কি আগে কঠোর নিয়মকানুন ছিল না? সেসব ভেঙ্গে লোকে বেরিয়ে আসে নি? নিয়ম ভাঙ্গতে হলে কাউকে না কাউকে সাহস দেখাতে হয়। তবেই বাঁধ ভাঙ্গা যায়।

—বাঁধ ভাঙ্গা জল বন্যা ডেকে আনে।

—মানে আপনার সে সাহস নেই।

মাধবী নিরুত্তর। দেয়ালের দিকে তার স্থির দৃষ্টি লক্ষ্যে এল। মরিয়া হয়ে বলে উঠলাম—বন্ধুত্ব করতে তো কোন দোষ নেই মাধবী।

সে এবার তাকাল আমার দিকে। তারপর খুব মৃদু স্বরে বলল—না দোষ নেই।

—শুনেছ কোথাও বন্ধু হলে তারা 'আপনি' 'আজ্ঞে' বলে সম্বোধন করে? এখন থেকে আমরা দুজন দুজনকে তুমি বলতে পারি না?

মাধবীর মুখে একটা আশ্চর্য সুন্দর হাসি বিচ্ছুরিত হল। তারপর সে চুপ। অখণ্ড নীরবতা। ভেতরে আমার তাণ্ডব চলছে। উত্তেজনা আমাকে মূক করে দিয়েছে। মাধবী এবার দেয়ালঘড়ির দিকে তাকালো। সম্বিত ফিরে এল। বেলা সাড়ে বারোটা। বললাম ঈশ্ তোমার রান্নাবান্না কিছুই হয় নি বোধ হয়। পা আটকে আছে। তবু উঠতে হল। চলি—বলে হাত বাড়ালাম। সামান্য ইতস্ততঃ করে সে এগিয়ে এল। খুব আলতোভাবে হাত স্পর্শ করল।

মাটির অনেক ওপরে হাওয়ায় ভাসছি। এত দীর্ঘবছর পর আমার এত কাছাকাছি সে। আর কিছুদিন অপেক্ষা। তারপর মাধবীকে নিজের করে নিতে কোন অসুবিধে হবে না। দু'দিন কাটাতে পারলাম না। একদিন বাদেই রাত সাড়ে ন'টায় ফোন করলাম। তেমন মিষ্টি গলা। —হ্যালো।

—আমি অর্ক। খবর সব ভাল তো?

—হ্যাঁ।

—কি করছ?

—একটা নতুন উপন্যাস শুরু করেছি। পড়ছি। বন্ধুত্বের সব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে বলে উঠলাম—মাধু তোমাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। কাল সকালে আসতে পারি?

মিষ্টি অথচ ভীষণ শক্ত স্বর মাধবীর—অর্কদা আপনি কিন্তু ভয়ানক ঘোরের মধ্যে আছেন। আছেন কি না?

—ঠিক ধরেছ। সেরকমই মনে হচ্ছে।

—মনকে শান্ত করুন। সংযত করুন নিজেকে। ভেবে দেখুন কী সব আবোল তাবোল বলেছেন এবং ভেবেছেন।

—মাধবী আমি শুধু তোমার বন্ধুত্ব চেয়েছিলাম।

—আমার আর একজনেব সঙ্গে যে ভীষণ বন্ধুত্ব অর্কদা।

—মানে? সে কে?

—কেন সুদীপকে আপনি চেনেন না?

—কিন্তু সে তো নেই।

—কে বলল নেই? দিনরাত সে আমায় সঙ্গ দিচ্ছে। তার ভালবাসায় আমি ডুবে আছি অর্কদা।

—মাধু প্লীজ!

—ঘুমোতে যান আর মনের স্বাস্থ্য রক্ষার চেষ্টা চালান। ফোনটা রাখছি কেমন?

দীর্ঘবছর গোপনতম ঘরে সযত্নে রাখা আমার মানস প্রতিমা কেমন অবলীলায় চোখের সামনে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে—নিঃসীম শূন্যে বাষ্পের মত মিলিয়ে যাচ্ছে এতদিনের সঞ্চিত প্রেম ভালবাসা মোহ—আমি অর্ক বোস এখন অসহায় ভাবে প্রত্যক্ষ করছি নিদারুন এই মৃত্যুদৃশ্য।

মোহ

ডোরবেলের সুইচে হাত লাগাতেই দরজা খুলে দিলেন শিবুমামা। ভীষণ খিদে পেয়েছে রিমার। সারারাস্তা ধরে রাকার আনন্দিত মুখটা ভাসছিল চোখের সামনে। আসলে খিদে পেয়েছে বললেই মা'র ব্যস্ততা দেখতে রিমার মজা লাগে। নিজেকে তখন কেমন যেন দামী বলে মনে হয়। শিবুমামাকে দেখে মনের ভাবনায় সামান্য হোঁচট—ও মামা? কখন এসেছ?

শিবুমামার নস্যি নেওয়া অভ্যেস। একটিপ নস্যি নাকে চালান করে বললেন—আর বলিস না। তোর মা সমর চ্যাটার্জীর সঙ্গে আলাপ করবে বলে অস্থির হয়ে গেছে। নিয়ে যাচ্ছি। এখান থেকে মিনিট পাঁচেকের পথ।

কাঁধের ব্যাগ সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে ভুরু উঁচিয়ে রিমা বলল—সমর চাটুজ্জ্যে? সে কে?

হাল্কা সবুজে বেস্ চওড়াপাড় টাঙ্গাইল শাড়ি পরনে রাকা ততক্ষণে বাইরের ঘরে। রিমা দেখল মাকে ভীষণ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। রেগে গেছে রাকা। মেয়ের দিকে না তাকিয়েই বলল—আজকালকার ছেলেমেয়ের জ্ঞানের বহর দ্যাখো। কিছু মনে করো না শিবুদা।

খুব রহস্যজনক লাগছে সবকিছু। তবু মা'র দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য রিমা বলল,—ভীষণ খিদে পেয়েছে মা।

—এত বড় হয়েছিস! নিজের খাবার নিজে করে খেতে পারিস না? টপ্ র‍্যামন আছে। করে খেয়ে নিস্। নয়ত ডাল ভাত মাছ সব ফ্রিজে আছে—গরম করে খেয়ে নে।

কব্জী উল্টে ঘড়ি দেখল রাকা। তারপর ব্যস্তভাবে বলল—চল শিবুদা—দেরী করলে হয়ত বেরিয়ে যাবেন।

—আরে কিব্যাপার! সমর চাটুজ্জ্যে লোকটা কে?

—ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে এম. এ পড়ছিস্? আর এঁর নাম জানিস না? সত্যি তোদের যে কি হবে।

শিবুমামা সোফা থেকে গা তুলতে তুলতে বলে ওঠেন—লেখক সমর চাটুজ্জ্যের নাম শুনিস নি? অনেকবছর ধরে লিখছে। এমন একটা নতুন দিক সে বেছে নিয়েছিল যে প্রথম বইটা বেরোতে একচোটেই লাল। বছর তিনেক আগে কি যেন কি একটা পুরস্কারও পেয়েছে।

মৌজ করে আরেক টিপ নস্যি নিয়ে সামান্য কেশে নিয়ে শিবু মামা বললেন—আমার সঙ্গে তার দারুন খাতির! বেরোবার সময় রাকা তার মেয়েকে বলল—কী হোল দিয়ে না দেখে ফট্ করে দরজা খুলে দিস না যেন। এতক্ষণে জলের মত সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। সত্যিকথা বলতে কি কোলকাতার এ ফ্ল্যাটে আসার পর থেকেই রাকার মুখে মেঘ জমতে শুরু করেছে। রাকার স্বামী স্বরূপ ঘোষ এখন এখানে থাকে না। রিটায়ারের পর ভাল অফার পেয়ে বম্বেতে আছে। আজকাল এঞ্জিনীয়ারিং লাইনে ডিজাইনের খুব দাম। সে রিটায়ারের আগে বিহারের এক নামকরা অরগানাইজেশনে ডিজাইন সেকশনে কাজ করত। গোছানো গাছানো পর্বে রাকার মেজাজ ঠিকই ছিল। তবে রিমা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার পর থেকে ফের মেজাজ বিগড়েছে। মাঝে মধ্যে রাকার মা'র জ্যাঠতুতো দাদার ছেলে শিবুদা এলে রিমা লক্ষ্য করেছে মা'র মেজাজ বদলে যায়। দূর অতীতের শৈশবস্মৃতির গল্পে দুজন তখন মশগুল। রাকার শিবুদা অকৃতদার, সমাজসেবী। রিমা বোঝে এবাড়িতে সারাক্ষণ বসে থাকলে তার চলবে না। মাসতিনেকের ভেতর বারচারেক এসেছেন তাই যথেষ্ট। কোথায় মা সামলাবে মেয়েকে না রিমার ওপরই যেন সব দায়িত্ব বর্তেছে। মা'কে বোঝাতে হচ্ছে রাত দিন।

—মনখারাপের সঙ্গে শরীর খারাপের একটা অদ্ভুত যোগাযোগ আছে তা জানো মা?

বড়দের মত করে বুঝিয়েছে—মানিয়ে চলাটাই জীবনের ধর্ম। উপদেশের উত্তরে রাকা বলেছে—ধুর, জমির স্পর্শ নেই, প্রজাপতি পাখি গাছ কিচ্ছু নেই। চারদেয়ালের মধ্যে বন্দী জীবন। এভাবে বাঁচা যায় নাকি? সত্যি করে বলতো রিমু ফেলে আসা আমাদের সেই বাগানটার কথা ভেবে তোর মনকেমন করে না?

—আমাদের বাগান বলো না মা। সরকারি কোয়ার্টার কাউকেই চিরদিনের মত দেওয়া হয় না। মন তো খারাপ হবেই। কিন্তু কি করা যাবে বল, খোদ কোলকাতায় বসে বাগান বাড়ির স্বপ্ন দেখা অলীক কল্পনা ছাড়া আর কি বলা যায়?

রিমা জানে তার দিন গুলো এখানে ভালই কাটছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছতে না পৌঁছতে একগাদা বন্ধু বান্ধব। নন্দনে দলবেঁধে সিনেমা যাওয়া। এর তার জন্মদিনে নামী দামী রেস্টুরেন্টে ঢুকে লোভনীয় খাদ্যের স্বাদগ্রহণ। কোলকাতার উচ্ছল জীবনে সবকিছুর ভেতর নতুনত্বের ছোঁয়া। মা'র কাছে এসব সে চেপে রাখে। মা'কে উজ্জীবিত করতে চায়।—কেন তোমার সেই হবি? লেখকদের চিঠি লেখা! চালিয়ে যাও।

আলমারির লকারে বিভিন্ন লেখকের উত্তরপত্রগুলো গয়নার থেকে বেশী আদরে সযত্নরক্ষিত তা জানে রিমা।

টপ্ র্যামনের মোটা সুতোগুলো মুখে পুরতে পুরতে মনে পড়ল রিমার—তখন আর কত বয়স তার? বছর চোদ্দ। গরমে মর্নিং স্কুল। স্কুল থেকে ফিরে স্নান সেরে ভাত খেয়ে সবে শুয়েছে। দুচোখ বুজে এসেছে এমন সময় রিমু রিমু বলে রাকার অতর্কিত চিৎকার। চিৎকারটা আসছে বাইরের বারান্দা থেকে। এরকম অকস্মিক চিৎকারে অবশ্য অভ্যস্ত রিমা। নিশ্চয় কোন নতুন ধরনের পাখি অথবা বিচিত্র রঙের সমন্বয়ের কোন প্রজাপতি এ ডাকের উৎস। ভর দুপুর বেলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে তবে কি তার মা পাখি দেখছে? তবে ক'দিন আগে রাকা তাকে 'হানিসাকার' পাখি দেখিয়েছিল। এক কথায় দারুন! লম্বা সরু ঠোঁট। দেহটা এত ছোট যেন প্রজাপতিকে সামান্য বড় করে তৈরী করেছেন ভগবান। ওড়ে যখন তিরতির করে কাঁপতে থাকে তার ছোট্ট দেহ। কী চক্চকে ময়ুরকণ্ঠী রঙ! জবাফুলের মধু খেতে ব্যস্ত সেই পাখিকে দেখে সেদিনের সকালটা মোহময় হয়ে উঠেছিল।

বারান্দায় যেতে রিমা দেখল মা'র হাতে খোলা ইনল্যান্ড। হানিসাকারের মত তিরতির করে কাঁপছে তার হাত। ভয়পাওয়া গলায় ও বলেছিল—দিদার কিছু হয় নি তো মা! সামনে ফিরতে মা'র হাসিমুখ দেখে ধড়ে প্রাণ এসেছিল। বড় চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রাকা বলেছিল—সৈয়দ মুজতবা সিরাজের চিঠি রে! পুরো তিন পাতার।

রিমা প্রচণ্ড রেগে গেছিল—লেখকের চিঠি? তাও যদি তোমার নিজের লেখা কিছু ছাপা হত! কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে তো?

রাগ পড়ে গেলে রিমা অবশ্য বলেছিল—কি সুন্দর চিঠি লিখেছেন তাই না মা?

টি ভি দেখার নেশা নেই রিমার। পড়তে মন লাগছে না। বই এর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মুখে যতই বলুক সদ্যছেড়ে আসা বাগানবাড়ির তুচ্ছাতিতুচ্ছ স্মৃতির দখলে মনের ওড়াউড়ি। একদিন টিফিনবাক্স নিতে গিয়ে দেখেছিল খাবার ভরা হয় নি। বাক্স ফাঁকা। মা নেই কোথাও। আচমকা রান্নাঘরের জানালা দিয়ে দেখেছে নিবিষ্টমনে একটি বেড়ে ওঠা চারা আমগাছের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে রাকা।

—একি মা? ওখানে কি করছ? টিফিন দেবে না? শুনতেই রাকার ঠোঁটে আঙ্গুল। আরেক হাত দিয়ে মেয়েকে ডাকছে নিঃশব্দে। মা'র কথামত বাগানে নেমেছিল রিমা। দেখেছিল একজোড়া টুনটুনি পাখি কী অসাধারণ দক্ষতায় মোটা সুতোর মত একটা কিছু দিয়ে দুটো বড় মাপের আমপাতা ঠোঁটের সাহায্যে রান সেলাই চালিয়ে জোড়া দিয়ে চলেছে। সেদিন বাস ধরতে পারে নি রিমা। স্কুটারে মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দেবার আগে স্বরূপ বলেছিল রাকাকে—শোন এরকম

পাগলামো করলে সংসার চালানো যায় না বুঝেছ? একারনেই বন্ধুবান্ধব আত্মীয় পরিজনের ভেতর মা'র 'ছিটেল' নাম প্রাপ্তির কথা জানে রিমা। সেকি জানে না তার সামান্য ক্ষ্যাপাটে মা'কে নিয়ে আড়ালে আবডালে ওরা হাসিতামাশা করে? তবু কেন কে জানে রিমার এই অন্য ধরনের মা'র প্রতি এক আলাদা আকর্ষণ বোধ জন্মে যাচ্ছে।

বসে বসে রিমা সমর চ্যাটার্জীর নাম স্মরণে আনবার চেষ্টা চালাতে থাকে। কিছুতেই মনে পড়ল না। নাঃ পড়া হয় নি এর বই। মিশনারী স্কুলের ছাত্রী হলে কি হবে পঞ্চাশ ষাট দশকের দুই বিভূতি, মানিক, তারাশঙ্কর, রাজশেখর বোস, বিমল মিত্র বুদ্ধদেব বোস থেকে হাল আমলের সত্যজিৎ সুনীল এবং অনেকের লেখা ওদের মানসিক জগতকে ঘিরে ছিল। রাকা'র অনবরত—পড়ে দেখ রিমু এই লেখাটা কী দারুন! এধরনের তাগাদায় তার বাংলা সাহিত্যজগতে এবয়সেও কিছুটা ঘোরাফেরা হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে থেকেও। লেখকদের অনবরত চিঠি পাঠানো দেখে স্বরূপ কতসময় তার স্ত্রীকে ঠাট্টা করেছে—ভাগ্যিস 'লেখক ফোবিয়া' 'কারফোবিয়া' নয় তাহলে ডাক্তারের কাছে ছোটাছুটি করতে হত। রাকাও বলেছে—যাই বল সারাগুষ্টিবংশে একজন লেখক নেই ব্যাপারটা বড়ই অসম্মানজনক। রিমাকে বলেছিল রাকা—শোন রিমু সিনেমার নায়ক নায়িকাকে কেন স্টার বলে রে? আসল স্টার তো লেখকরা। মানুষের সুখদুঃখের জগৎ নিয়ে যাদের কারবার। সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ মানুষ, যাদের হৃদয় অপরের দুঃখবেদনায় সাড়া দেয়, তারাই তো আসল স্টার।

ঘড়ির কাঁটা দশটা ছুঁয়েছে। রাকার আসার নাম নেই। লেখকদের সময়ের দাম কত তা কি রাকা জানে না? এতক্ষণ সে লেখকের বাড়ি বসে আছে হতেই পারে না। বোকাবুদ্ধি মা'টা তার কি করছে কে জানে? এসব ভাবতে ভাবতেই দশটা পনেরো নাগাদ প্রতীক্ষিত ডোরবেলের আওয়াজ শোনা যায়। সেলোফিন প্যাকেটে মোড়া, বই হবে নিশ্চয়, নিয়ে রাকা ঘরে ঢোকে।

—কি ভেবেছ বল তো মা? এত রাত! বই কোত্থেকে কিনলে? একা একা কলেজস্ট্রিটে গিয়েছিলে নাকি?

উত্তরহীন রাকা তার ক্লান্ত দেহ সোফার ওপর এলিয়ে দেয়। তারপর যেন ঘোরের মধ্যে বলতে থাকে—মস্ত নামী লেখক বুঝেছিস? ভদ্রলোকের স্ত্রী চা পাঁপড় ভাজা খাইয়েছে। কোন অহঙ্কার নেই। এনার বই তো তেমন পড়ি নি। বাব্বাঃ যা বুক ধ্বক্‌ধ্বক করছিল না! যদি কোন প্রশ্ন করেন কি উত্তর দেব ভেবে নার্ভাস লাগছিল। সেই জন্যই তো ওনার লেখা তিনটে বই কিনে এনেছি। ঠিক করেছি কি বল? দে এক গ্লাস জল দে। জলের গ্লাস নিতে নিতে রাকা বলল—রবিবার রাত্রে ওনাদের খেতে বলেছি। এক কথাতেই রাজী।

—শিবুমামাকে বলেছ?

—বলেছিলাম। বিয়ের নেমন্তন্ন সেদিন। পরে একদিন খাইয়ে দেব।

রবিবার দেরী করে ওঠা সম্ভব হয় নি রিমার। ধুমধাম আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেছে। পাশে তাকিয়ে দেখে মা নেই। বাইরের ঘর সাজাতে শুরু করেছে। ব্রাশে পেস্ট লাগাতে লাগাতে রিমা বলেছিল—পাগলামো করো না মা। রাকার হাতে ধুলোঝাড়পোছের তোয়ালে। মেয়ের শাসন তুচ্ছ। ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে যেন সে নিজেই নিজেকে শুনিয়ে বলছে—জীবনে প্রথম একজন পুরস্কৃত লেখককে বাড়িতে আনতে পারছি—একি কম সৌভাগ্য নাকি?

বাজার যাবার আগে রিমাকে বলেছে রাকা—গল্পসমগ্র থেকে ক'টা গল্প পড়ে রাখিস। হঠাৎ যদি নিজের লেখা থেকে কিছু জিজ্ঞেস করেন—কিছু তো বলতে পারবি।

সামান্য ঔৎসুক্য রিমার বুকে টোকা মারে। পরপর অনেক গল্প পড়ার চেষ্টা চালিয়েছে সে। মনসংযোগ করতে পারেনি। কেমন যেন ঘেষো ভাষা এবং আকর্ষণহীন লেখা।

বিশাল বাজার এলাহি কাণ্ড করেছে রাকা। কিছু বলতে গেলে মা অভিমান করবে জানে রিমা। সে কিছু বলে না। দুপুরে সদ্যকেনা চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে বইতিনটে নিয়ে শুয়েছে রাকা। রিমা আড়চোখে মা'র হাবভাব লক্ষ্য করছে। পাতা ওল্টাচ্ছে রাকা মাঝে মাঝে থামছে আবার ওল্টাচ্ছে। তন্দ্রামত এসেছিল। ফোন বাজতে ঘুম চট্‌কে যায় রিমার। তার আগেই রাকা লাফিয়ে উঠে ফোন ধরেছে।

—হ্যালো? আরে ছোটমাসী? খবর জানো? আজ আমাদের বাড়ি লেখক সমর চাটুজ্জ্যে আসছেন বুঝেছ?

সামান্য বিরতি। রাকার গলা চুপসে যায়—কেন? তাইনাকি? কিন্তু আমি তার বইতে দেখলাম নানা পুরস্কার পেয়েছেন?

তারপর সামান্য হুঁ হাঁ। রিসিভার রেখে দিল রাকা। রাকার সঙ্গে ছোটদিদার ফোনালাপ শুরু হলে থামতে চায় না। আসলে রিমা জানে ছোটদিদাও অনেকটা মা'র মত। রাতদিন গল্পের বই নিয়ে বসে থাকেন। লেখকদের হালহকিকতের খোঁজ রাখেন। এদের সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতা রিমাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। কি হল? ফোন রেখে দিলে?

মেয়ের মুখের দিকে চোখ রেখে রাকা বলে—তোর ছোট্‌দিদা যে এত ঈর্ষাকাতর জানা ছিল না। খিক্‌খিক্ করে হেসে কি বলল জানিস—শেষ পর্যন্ত সমর চাটুজ্জ্যেকে ধরলি? ওর নাম তো 'ফ্রকতোলা' সাহিত্যিক। কথায় কথায় ছেলেমানুষ নায়কদেরসামনে উঠতিবয়সের মেয়েরা ফ্রক তুলে দিচ্ছে—উলঙ্গ হয়ে

সাঁতার কাটছে—হাঁসেদের জলকেলির বৃত্তান্ত ছ্যাঁ ছ্যাঁ...

সামান্যবাদে রাকা খুব সিরিয়াসলি বলল—তা গ্রামগঞ্জ নিয়ে লিখলে সবাই কি আর পথের পাঁচালির লেখক হতে পারে? না আশা করা উচিত? অত খুঁত ধরা ঠিক? ছোট্‌মাসী একটা যাচ্ছেতাই।

কেন কে জানে এই বোকাসোকা মা'র প্রতি অসীম দুর্বলতায় মনটা কন্‌কনিয়ে উঠছে রিমার। ভাবতে থাকে অন্য কেউ মা হলে এই মহিলার কাছে থেকে সে যা পেয়েছে তা কি পেতে পারত? তার বাস্তব অভিজ্ঞতার গল্প যেন সব রূপকথাকে ছাপিয়ে যায়। মনের ক্যামেরায় তুলে রাখা ছবিগুলো যখন একের পর এক মেলে ধরেছে রাকা, রিমা'র বিস্ময়বিমুগ্ধ চোখ যেন সিনেমাটিক ভিশনে মোহগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। আপ্লুত হয়ে গিয়েছে তার কচি মন।

সাতসমুদ্র তেরনদীর পারে এক রোমাঞ্চকর স্বপ্নের রাজ্যে ছিল নাকি রাকাদের দেশের বাড়ি। শহর থেকে শীত গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশের বাড়িতে যাওয়া হত তাদের। স্টেশন থেকে নেমে যতদূর দৃষ্টি যায় দুধারে সবুজ বন চিরে সাদা ধুলোর রাস্তা। রাকার ঠাকুর্দার ছিল নিজস্ব পাল্কি। সে পাল্কি পাঠানো হত স্টেশনে। পাল্কির ভেতর থেকে চারটে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের মাথা বেরিয়ে থাকত ঘাড়ে তোলা যানটির দরজার ফাঁক গলে। রাস্তার দু'পাশে কুঁচফল গাছের ঝোপ। লাল কালো মেশানো কুটি কুটি ফলের ঝাড়ে গাছের শোভা। সাদাবেগ্‌নেতে মেশানো ঘেটুফুলের সমারোহ। শীতে দুপাশের রাস্তা জুড়ে টোপা টোপা বনকুল বেঁটে বেঁটে গাছে। বাহকদের গুন্‌গুনধ্বনি—বাবুর বাড়ি হুহুম্ না আর পারি না হুহুম্ না, যেন সম্মিলিত মৌমাছির গুঞ্জনধ্বনি। সে রাস্তায় কোলে কাঁখে বাচ্চা নিয়ে চাষী বৌ, টোকা মাথায় চাষীদের যাতায়াত যেন চলন্ত ছবি। পাল্কি থামিয়ে কোন চাষীর ভদ্রতাজনিত প্রশ্ন—বেড়াতি আলা? কেমুন আ-চো? খপর সব ভালো তো?

জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় ধোঁয়া উড়িয়ে রেলগাড়ির ঝিক্‌ঝিক শব্দে ছুটে যাওয়া। রাকার ঠাকুর্দা ভদ্রলোকটি নাকি দারুন সৌখিন ছিলেন। ফলফুলের গাছের ওপর ছিল তার অসীম দুর্বলতা। সাহেববন্ধুর পরামর্শমত সেই অজ পাড়াগাঁয়ে তৈরি করা হয়েছিল লাল টুক্‌টুকে 'টি', শেপের দোতলা বাড়ি। কাঁচের শার্সি লাগানো বিশাল মাপের দরজা জানলা। বাড়ির সামনে চন্দনগাছের বেড় দিয়ে তৈরি ফুলের বাগান। কত রকমের গোলাপ কেয়া লিলি রজনীগন্ধা যুঁই ভুঁইচাপার প্রস্ফুটিত ফুলে ঝল্‌মলে সে বাগান। বাড়ি ঢোকবার মুখে প্রায় বটগাছের বিশালত্ব নিয়ে অভ্যর্থনা জানাত 'ম্যাগনোলিয়া গ্ল্যান্ডিফ্লোরা'র গাছটি। শীতে প্রতি শাখায় সে ফুটিয়ে রাখত অতিক্ষুদ্র শ'শ ফুলের সমন্বয়ে তৈরি লাল টক্‌টকে বিশাল গোলক। গ্রীষ্মে তার ঝোপধরা বর্ণময় পাতার গুচ্ছ'র শোভা ছিল ফুলেরই মত।

দুপুরের দিকে পৌঁছলে ধুপধাপ পাল্কি থেকে নেমেই এক ছুটে চন্দনা নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া। জ্যাঠা কাকা ঠামা বড়মা কারোই কোন আপত্তি নেই। বাচ্চারা নদী উথালপাথাল করবে এটাই ছিল নিয়ম। ঘন জঙ্গলের ভেতর উঁচু থেকে নিচে নামা সরু পথ অনেকটা। তারপর সেই কাঙ্খিত— ছোট্ট নদীটি পটে আঁকা ছবিটি। জঙ্গলের ভেতর গাছেদের ঘিরে যুঁই মাধবীর লতার বিস্তার। ফুটে থাকা ফুলের সুবাসমাখা হাওয়া আশ্চর্য মাদকতাময়। সরু রাস্তাটায় সজারুর রঙ্গীন পুচ্ছ তুলে ছোটা বা বেজী সাপের লড়াই দেখে থেমে যাওয়া—কখনো কখনো রাস্তা জুড়ে কাঠের গুঁড়ির মত হলদে বা মেটে রঙের পাইথনের বিশ্রাম নেওয়া। হাঁসের টুঁটি চেপে ধরে শেয়ালের পলায়ন দৃশ্য—এসব ঘটনা আনন্দের ফুলকি ঝড়ানো বা হিমশীতল করে দেওয়া অনুভব। নৌকোয় চেপে চার শিশুর নদীর বুকে নিরুদ্দেশ যাত্রা—জেলেদের হাতে ধরা পড়ে বাড়ি ফিরে পেটানি খাওয়া এসব রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনতে শুনতে রিমা কতবার পাখনা মেলে ঘুরে এসেছে সেই রূপকথার দেশে। ভাগ্যিস দেশভাগের পর ক'বছর রাকাদের প্রায় পুরো পরিবার জন্মভূমি আঁকড়ে পড়েছিল। না হলে রূপকথার সে দেশের সঙ্গে রিমার দেখাই হত না।

ভাতঘুম দিয়ে উঠে বাইরের ঘরের সাজগোজ চেহারা দেখে মন ভাল হয়ে গেল রিমার। একগুচ্ছ রজনীগন্ধার সৌরভে ঘর ভারী।—কখন আসবেন তারা? মুখে টানটান উত্তেজনা নিয়ে বলল রাকা—বলেছি তো অনেকবার করে তাড়াতাড়ি আসবার জন্য—দ্যাখ কখন আসেন। ফোন বাজছে। শোবার ঘরে গিয়ে রাকা ফোন ধরল। মুখে একপোঁচ চুনকালি মেখে ফিরে এসেছে। আন্দাজে প্রশ্ন ছুঁড়েছে রিমা—কি হল? লেখকমহাশয় আসবেন না এই তো?

—ধুর তোর যত কথা। আসলে ওনাদের শরীর খারাপ তো। তাই রিক্সা করে আমাদের গিয়ে নিয়ে আসতে বললেন। মা'র জব্দে পড়া মুখ দেখে করুণার উদ্রেক হয়। রিমা মনের বিরক্তি চেপে রাখে। লেখককে আনতে গ্রীলে তালা ঝুলিয়ে মা মেয়ে বেরিয়ে পড়ে। বাংলা পাঁচের মত মুখের লেখকমশায় এবং ছাপছাপ নাইলন শাড়িপরিহিতা কালোকুলো বিশালাকার লেখকের স্ত্রীর স্থূল চেহারা রিমার মনে কোনই রেখাপাত করে না। এই সামান্য দূরত্বে খালি রিক্সা মেলে না। কারণ কোন রিক্সাস্ট্যান্ড এখানে নেই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর রিক্সা মেলে। রিক্সাওয়ালার হাতে ভাড়া গুঁজে দিয়ে মা মেয়ে হাঁটতে থাকে।

ঘরে পা দিয়েই মহিলা বলেন—বাঃ কী সুন্দর ফ্ল্যাট! কী সাজানো। এমন সাজানো সুন্দর ফ্ল্যাটে এরকম মা মেয়েকেই মানায়।

মহিলার মিষ্টি কথাবার্তায় জমা মেঘ উড়ে যায়। মহিলা কলকল শব্দে কথা বলছে। ওদের ঘর সংসারের খোঁজ নিচ্ছে। লেখক গম্ভীর এবং চুপচাপ। আসর ঠিক জমছে না। ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো টাকরা আলাপ চলছে। কিছুক্ষণ বাদ রিমার মনে হল লেখক মহাশয়ের মুখের প্যাঁচ খুলে গিয়ে কিছুটা স্বাভাবিক পর্যায়ে এসেছে। আর তাই হয়ত রাকা তাকে প্রশ্ন করেছে—দাদা আপনি লেখার প্রেরণা পেলেন কি ভাবে?

—প্রেরণা ফ্রেরনা নয় স্রেফ টাকার জন্য ল্যাখার জগতে আসছি।

—আপনার লেখা প্রথম বইটা তো বেশ নাম করেছে।

—আসলে যে বিষয়টা বাছছিলাম ওই বিষয়ে তেমন কোন বাংলা বই ল্যাখা হয় নাই, ওর জন্যই...

—আপনি 'বনের পাখি' ছোটগল্পে সাঁকোর বর্ণনা দিয়েছিলেন—আমি ছেলে বেলায় নিজে নদীর ওপর বাঁশের সাঁকোয় পারাপার করেছি। আর যে বুনো গাছের কথা লিখেছেন...

রাকার কথা শেষ হতে দেন না লেখকমহাশয়। তার আগেই বলে ওঠেন যা লিখি বানাইয়া বানাইয়া লিখি। ল্যাখার পর কিচ্ছু মনে থাকে না আমার। সব ভুইল্যা যাই। সামান্য থেমে বলেন—এবার খাবার দিলেই হয়। আমি আবার খুউব টাইম মেইনটেন করি।

ওরা চলে যেতে রাকা মেয়েকে বলেছে—রিমু তোর ছোট্‌দিদাকে কিছু বলবার দরকার নেই বুঝলি? রাকার মুখে বিষাদচিহ্ন। কি যেন ভাবছে রাতদিন। রিমা বলেছে —মা লেখকরা মানুষ।

—কেন আমি কি বলেছি তারা মানুষ নন? তিনচারদিন বাদ ইউনিভারসিটি ফেরৎ একমুখ হাসি নিয়ে রাকাকে দরজা খুলতে দেখে রিমা ঠাট্টা করল—আবার কি কোন নতুন লেখকের সন্ধান পেয়েছ?

—সমর চ্যাটার্জীর স্ত্রী এসেছিলেন রে। ওদের নাকি আমাকে খুব ভাল লেগেছে। রান্নার প্রশংসা করছিলেন। লেখক নাকি বলেছেন মিসেস ঘোষের ভেতর এক কল্পনাপ্রবণ মন আছে।

রিমা বলল—বাঃ এবার শান্তি পেলে তো? এরপর রিমাকে প্রায়ই দেখতে হয়েছে মহিলা বসে বসে রাকার গুণগান করছেন। তার উদ্দেশ্যে প্লেটে রাখা রাকার হাতে তৈরি নানাধরনের স্বাদু খাবার। একদিন তিনি তার বান্ধবীকে সিনেমা দেখার অফার দিয়েছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে ফোনে তার যাবার অসুবিধে জানিয়ে বান্ধবীর উত্তেজনায় জল ঢেলে দিয়েছিলেন।

কিঞ্চিত ম্রিয়মান রাকাকে একদিন উত্তেজনার তুঙ্গে দেখতে পেল রিমা। মহিলা তার বান্ধবীর জন্য দুর্দান্ত একখানা শাড়ি কিনে রেখেছেন। রাকা বলেছে—আমার জন্য কেন আপনি শাড়ি কিনতে গেলেন দিদি? শাড়ির কোন দরকারই নেই।

মহিলা রাকার কথায় কোন পাত্তা দেন নি শাড়ির প্যাকেট হাতে তাকে ঢুকতে দেখে তা বোঝা গিয়েছিল। লজ্জায় লাল রাকার মুখ।—অত করে বললাম শাড়ির দরকার নেই। আমার ভীষণ লজ্জা করছে দিদি। সোফায় বসতে বসতে মহিলা বললেন—লজ্জা পাচ্ছো কেন? দামটা তো তুমিই দিচ্ছ। বেশী নয় মাত্র সাড়ে পাঁচশো টাকা।

প্যাকেট খুলে রঙচঙে কিম্ভুত খেলো শাড়িটা বার করতে চম্‌কে উঠেছে মা মেয়ে। মহিলা বলে চলেছেন—আমার পছন্দ দেখেছ? কেমন মানাবে তোমায় বল দেখি?

—না মাসিমা এ শাড়ি মাকে পরতে দেব না।

—ওমা কেন?

—তাহলে মাকে মা মা মনে হবে না। রিমার কঠিন গলায় নার্ভাসনেসে কাহিল রাকা মহিলার মুখে কোন ভাবান্তর দেখতে পেল না। শাড়িটা ফের প্যাকেটে পুরে তিনি দিব্যি ঘন্টাখানেক গল্প চালিয়ে গেলেন। আর কী আশ্চর্য যাবার আগে রিমার হাত ধরে সামনের রবিবার সকালে তাদের চা খাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন। তিনি বিদায় নেবামাত্র রাকা বলেছিল মেয়েকে—তোর সাহস দেখে আমি অবাক।

—বিপদে প্র্যাক্‌টিক্যাল হওয়া দরকার।

—মহিলার চরিত্র বোঝাই যাচ্ছে না।

—এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমি একমত।

—থাক্‌গে চায়ের নেমন্তন্নে যাব না।

—ওইটে করো না। তাঁর নেমন্তন্ন খুব আন্তরিক।

দরজা খুলেই মহিলার সহর্ষ আপ্যায়নে মুগ্ধ হয় রাকা রিমা। সামান্য অস্বস্তি মুহূর্তে মিলিয়ে যায়।

—যাক্ এসেছ তাহলে। বসো ভাই। তোমাদের বাড়ি কতবার গিয়েছি, কতকিছু খেয়েছি। লেখক সমর চ্যাটার্জী সামনের সোফায় বসে। ভাবলেশহীন গাম্ভীর্য মাখা মুখ দেখে ভদ্রতাসূচক হাসি গিলে নিল রাকা। মিলিয়ে যাওয়া অস্বস্তি ফিরে আসে। মহিলা চায়ের ট্রে হাতে ঘরে ঢোকেন। চা দিতে দিতে বলেন—আমি ভাই শুধু মিষ্টি কেকের বন্দোবস্ত করেছি। তোমার মত অতশত কিছু বানাতে পারি না আমি। কিছু মনে করো না কেমন?

—কি বলছেন? কেন কিছু মনে করবো?

মহিলা 'আসছি' বলে বেরিয়ে যান। বোধহয় কেক আনতে। রাকা সবে চায়ে চুমুক দিয়েছে এমন সময় সমর চ্যাটার্জী—টুনি, টুনি কই গেলা? যাও চান করতে যাও।

ফাঁকা ঘরে মা মেয়ে টুনিকে খোঁজে। ভদ্রলোক কি নাতনিকে খুঁজছেন? মহিলা মিষ্টি কেকের প্লেট নিয়ে এসেছেন।

—কি হচ্ছে কি এসব? কথা কানে যায় না নাকি? যাও চান করতে যাও এক্ষনি।

বোঝা যায় বিশালবপু মহিলার নাম টুনি। টুনি ঘুরে দাঁড়ান—বেলা দশটায় কবে চান করি আমি? ওনারা এসেছেন। এরকম অভদ্রতা করছ কেন?

—মুখে মুখে তর্ক কইরো না। মোজা খোল। ভিজ্যা গেছে দ্যাখতে পাও না? চান করতে যাইবা কিনা?

এক ধরনের নক্কারজনক অনুভূতিতে রাকার সারা শরীর মন বিবশ হয়ে যাচ্ছে। রিমা মা'র দিকে তাকায় এবং উঠে দাঁড়ায়—ওঠ মা। মাসিমা যাই।

মহিলার অনুরোধ উপরোধ রাকার মত বোকাসোকা নরম মানুষকে টলাতে পারল না দেখে রিমা খুশী হল।

এক চুমুক চা মিষ্টির প্লেট লেখকদের সম্বন্ধে ধরাছোঁয়ার বাইরে আকাশের 'তারা'র মোহ সব ফেলে রেখে ওরা আস্তে আস্তে রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকে। চুপচাপ। দক্ষিণমুখো রাস্তাটাতে সুশীতল হাওয়া বইছিল। হয়ত গঙ্গার কিংবা কে জানে কোথাকার হাওয়া। তাজা ফুরফুরে হাওয়ায় মা মেয়ে খুব স্বস্তির সঙ্গে নিশ্বাস নিতে থাকে।

ভিন্ন জাইত

কদিন বাদ আজ ঝাঁপিয়ে রোদ উঠেছে। মেঘলা মেঘলা থাকলে সময়ের আন্দাজ করা বড় কঠিন। অবশ্য শিবু বাড়ি থাকলে আলাদা কথা। ওদের ঝুপড়ি ঘরে একটিমাত্র বিলাসদ্রব্য আছে। শিবুর ঘড়ি। কোন আমলে হঠাৎ করে লাভের মুখ দেখায় নগদ একশ টাকা ব্যয়ে ঝপ্ করে ঘড়িটা কিনে ফেলেছিল শিবু। তা আজ পর্যন্ত ঘড়িটা তার কাঁটায় সময় দেখাতে কোন অসুবিধে করে নি। দিব্যি চলছে ঠুকুস ঠুকুস করে। শত অভাবে ওরা কিন্তু কেউ ঘড়ি বিক্রির চিন্তা করে নি। শিবু এখন বাড়ি নেই। শিবু বিন্দু দুই ভাইবোনই সেই সাতসকালে পেটে গুড়ো চায়ের লিকার পুরে বেরিয়ে গেছে। কোথায় নাকি ওদের মিটিন আছে।

বাসনা খানিকক্ষণ তেলশূন্য স্টোভটা দেখতে থাকল। কোণায় অবহেলাভরে পড়ে আছে। কবে যে আবার 'কেরাচিনি' কেনবার ক্ষ্যামতা হবে কে জানে? ভাবে মনে স্টোভে ত্যাল থাকলি ওদের কিছুমিছু করে দেওয়া যেত। সে পাশের ঝুপড়ির ভব মণ্ডলের বৌএর চুলাতে চায়ের জল ফুটিয়ে এনেছিল। যাবার সময় শিবু বলে গেছে—মা তুই ভাত তয়ের করে রাখিস। মিটিন সেরে ফিরতে ফিরতে বেলা একটা কি দুটো হবে—তখন খেয়ে বেরোব।

বাজারটা বাসনা নিজেই করে। ছেলেকে কিছু বলতে ইচ্ছে করে না। বললে কি আর বাজারটা করে দেবে না শিবু? কিন্তু না—বাসনার মত বুদ্ধি করে সামান্য পয়সায় দুবেলা ছ'টা পেটের বন্দোবস্ত ওর সাধ্যিতে কুলোবে না। সে ঘরের বাইরে উঁকি মেরে রদ্দুর দেখল। সাড়ে দশটা পেরিয়ে গেছে বলে মনে হল। সময়ের আন্দাজ করতে পেরে মন খুশী হয়ে উঠল। ভাঙ্গার মুখে বাজার সস্তা হয় তা কে না জানে?

বাইরে বেরোবার লালপাড় সাদা খোলের শাড়িটা দড়িতে ঝুলছে। অবশ্য তার সাদা রঙ এখন বিবর্ণ হলদেটে। বেশ কিছু জায়গায় সেলাই পড়েছে—তবু শাড়িটা গোটা। বাইরে বেরোবার একমাত্র আচ্ছাদন। বাড়িতে পরার শাড়িদুটো ছিঁড়তে ছিঁড়তে এমন বেহাল অবস্থা হয়েছে যে তা পরে বাইরে বেরোন কোনমতেই সম্ভব নয়।

যাবার সময় শিবু একটা পাঁচটাকার নোটের সঙ্গে কিছু খুচড়ো পয়সা দিয়ে গেছিল। বাসনা নোটটা টানটুন করে দেখে নিল। বাজারে যা সব ছেঁড়া নোটের আমদানি হয়েছে! নাঃ ঠিকই আছে। ছেঁড়াছুড়ো নেই। খানিকক্ষণ কি যেন ভাবল

বাসনা—তারপর বিছানার তলা থেকে একটাকার কয়েনটা বার করল। মনে মনে হিসেব করেছে। নিদেন দুবেলার জন্য সাতশো চাল কিনতেই হবে। আট টাকা কিলো হলি সাতশোর দাম পড়বে পাঁচ টাকা ষাট। ফের হিসেব করে খুচড়ো গুনে। বাকি থাকে পাঁচ পয়সা কম এক টাকা। তা দিয়ে কেনা যাবে কোন তরকারি। আলু কিনতি মানা করে গেছে শিবু। লাগাতার আলু খেতি খেতি তার নাকি অরুচি ধরিছে।

মাস কয়েক আগেও বাসনা শিবুর দোকানে বিন্দুর সঙ্গে খদ্দের ডাকার কাজ করত। চেঁচাত কি! হেরে যেত বিন্দু।—অ মা—অ বাবু আসেন ইদিকে—দেইখ্যা যান কী সস্তায় কেমুন মেক্সি সালোয়ার কামিজ। কিনতে হইব না—শুধু দেইখ্যা যান—সস্তা জলের দর।

তারপর হঠাৎ কি যে শুরু হল। বাসনার মাথায় কিছুই ঢোকে না। চুরি করে নাই বাটপাড়ি করে নাই। তাও ঢাল তলোয়ার লইয়া পুলিশেরা সব ঝাঁপাঝাঁপি করতে লাগছে। শিবুই তাকে আর ফুটে দাঁড়াতে দেয় নি। বলেছে সে—তর যা শরীল। পুলিশের এক ঘা লাঠির বাড়ি খাইলে এ জন্ম শ্যাষ।

আগে ভাগে চালটা কিনে নিল বাসনা। তারপর সে দুপাশের ফুটে ভাঙ্গা বাজার দেখতে দেখতে এগোতে থাকে।—অ দিদি ইদিকে আস। কচু নিবা নি? একরাশ শুকনো শুকনো সবজে কচুর ডাটা নিয়ে বসে থাকা লোকটি বাসনার মুখচেনা। দাঁড়িয়ে গেল।

—কত কইর‍্যা গো ভাই?

—দাও দুইট্যা টাকা। সব লইয়া যাও। কেমুন রদ্দুর উঠছে দেখছনি? বাড়ি যামু। হের লাইগ্যা সস্তায় ছাইড়্যা দিত্যাছি।

—এক টাকায় যদি সবগুলান দিতি পার তয় দাও।

—পারুম না।

লোকটার প্যাঁচার মত মুখ দেখে বাসনা হাঁটা দিল। সে নিশ্চিত জানে এক টাকায় অত কচু দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া নিলেই বা সে রান্নার আগুন পাবে কোথায়? যে ক'টা গুল আছে কচু রাঁধতে গিয়ে তার অনেকটা খরচা হয়ে যাবে। এসব ভাবতে ভাবতেই তরকারিওয়ালার জোর গলায় আওয়াজ কানে ঢোকে—অ দিদি আস আস নিয়া যাও। মুখে হাসি ফুটিয়ে এগিয়ে এল বাসনা। ফের হিসেব কষা হয়ে গেছে। গুল খরচা হইব ঠিক কথা। তেমনি ঘন্ট হইব অনেকটা। ভাতের খরচা কম হইব। প্যাট ভরন নিয়া কথা।

পাঁচ নয়া কম দেখে লোকটা বাসনার মুখের দিকে তাকালো একবার। কিছু বলল না। ক'টা কাঁচালঙ্কা পড়েছিল পাশে। দেখে পরদিন চার আনা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে লঙ্কা কটা চেয়ে নিলে ও।

পুজোর আগ দিয়ে ভরদুপুরেও এসব 'ফুটে' লোক গিজগিজ করে। পরপর ক'দিন হকার পুলিশ খণ্ডযুদ্ধ হওয়াতে বোধহয় আজ তেমন ভীড় নেই। তবে কোনক্রমেই 'ফুটে' বসার সাহস আর কারো নেই। ওরা তাই এক অভিনব পন্থা বার করেছে। প্রায় প্রত্যেক হকারের কাঁধে একটা করে লম্বা ডাণ্ডা। তার ওপর ওদের বিক্রিবাটার সামগ্রী। কেউ কেউ হাতে গলায় জিনিস ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শিবু লম্বা ডাণ্ডাটা দু'কাঁধ বরাবর বসিয়ে নিল। চোখেমুখে সামান্য ত্রস্ততা ফুটে উঠেছে। লোকজন বিশেষ নেই অথচ কোত্থেকে যেন খট্‌খট্ ধ্বনি ভেসে আসছে। শিবুর দৃষ্টি এখন দুরবীন। কিন্তু সে কিছু দেখতে পেল না। বোনকে ধমক লাগালো—কি করস কি? তাড়াতাড়ি কর।

বিন্দু ফুটের ওপর একগুচ্ছ ভাঁজকরা সালোয়ার কামিজ ম্যাক্সির সামনে উবু হয়ে বসেছিল। দাদার ধম্‌কানিতে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে শিবুর কাঁধে ডাণ্ডার ওপর টকাটক সব ঝুলিয়ে দিতে শুরু করল। ভারের চোটে ও খানিকটা ঝুঁকে গেল সামনেরদিকে। দেখতে লাগছে যেন ক্রুশবিদ্ধ যীশু। শিবুর বয়স প্রায় ত্রিশ। দেখলে মনে হয় আঠারো কি কুড়ি। শীর্ণ ছোট্টখাট্টো চেহারা। ইটের ফাঁকফোঁকরে গজিয়ে ওঠা না খেতে পাওয়া জীর্ণ গাছের মত। শিবু ঝোঁকা অবস্থায় পুলিশদের গালাগাল দিচ্ছিল। ক'মাস ধরে শুধু ঝামেলা আর ঝামেলা। প্যাটে খাওয়া নাই। ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মিটিনের ওপর বিতৃষ্ণা। কতবার যে মিটিন হল! অবস্থা যে কে সেই। দাঁতে দাঁতে চেপে বলল ও—হালায় আশায় মরে চাষা।

খট্ খট্ খট্। জান্তব শব্দ। চমকে উঠল বিন্দু। জংলা প্রিন্টের ড্রেস—গাট্টাগোট্টা লোকগুলান হেঁটে গেল সামনে দিয়ে। ও গুলানরে কয় র‍্যাফ্। মিটিনে শুনেছে সে। তীক্ষ্ণচোখে একজন দেখে নিল ওদের আপাদমস্তক। বিন্দু খানিকটা কুঁকড়ে গেল। দাদার দিকে তাকালো। ক'দিন ধরে শিবু হাতে আর ঘাড়ের ব্যাথায় কোঁ কোঁ করছিল। শ্যাষ আঁচে ন্যাকরা গরম করে সেঁক দিয়েছিল বিন্দু। মনে হল দাদা তার আরো রোগা হয়ে গেছে। শখের হাতঘড়িটা নেমে এসেছে হাতের গোড়ায়। ঢলঢল করছে। দাদাকে দেখে বিন্দু মায়াপূর্ণ অস্থিরতায় কাহিল হতে থাকে। সেকারণেই বোধহয় বলে ওঠে—দাদা এবারে আমারে দে। আমি ঘাড়ে লইয়া দাঁড়াই।

—চুপ যা। তর যা চেহারা! পাঁচমিনিটও দাঁড়াইতে পারবি না। বরং তুই খদ্দের ধর। আর ওনারা আসতেছেন কি না নজর রাখ।

বিন্দুর পরনে রংচটা সালোয়ার কামিজ। তেলহীন রুক্ষ চুলগুলো টেনে বেঁধেছে। পনিটেলের আকারে ঝুলছে শুষ্ক চুলের গুচ্ছ। গতবছর পুজোয় শিবু ওকে সস্তাদামের ট্যালকম পাউডার কিনে দিয়েছিল। সে তারই খানিকটা মুখে মেখেছে। তাইতে ওর শুকনো মুখখানা আরও শুকনো দেখাচ্ছে। মনে পড়ল

গতবছর পুজোতে এসময় লাভের মুখ দেখাতে কাঁচের চুড়ি ফল্‌স গয়না কত কি কেনা হয়েছিল। বড়সড় নিশ্বাস ফেলল বিন্দু। এবারে বিক্রিবাটা নাই। প্যাটের ভাত নাই তার পূজা! খদ্দের ধরার হাঁকডাক স্তব্ধ। ও এখন যথাসম্ভব গলা লম্বা করে ত্যানাদের দেখতে থাকে। বুনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ শিবুর খোলের বাইরে মুখ বার করা, কচ্ছপের কথা মনে হল। টহলদারী যথেষ্ট জোরদার। আসছে ওরা। একগাদা পুলিশের মাঝে সাদা ধপ্‌ধপে ড্রেস। কালোসোনালিতে চক্‌ককে কী সব ব্যাজ লাগানো পোষাকে একজন—বড়সড় কেউকেটা হবেন। পরিপুষ্ট চেহারা—সামান্য ভূড়ি—লালচে ফরসা লোকটাকে দেখামাত্র বিন্দুর ছোট্ট চেহারা আরও ছোট্ট হয়ে যায়। সে সভয়ে মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। শিবু যথাসম্ভব তার দৃষ্টিতে উদাস ভঙ্গি বজায় রাখে। চারপাশে যখন আলোর ঝল্‌কানি তখন ওরা বুঝতে পারল সন্ধ্যা নেমেছে। ভীড় বাড়ছে কিন্তু খদ্দের নেই। 'ফুটে' রঙবেরঙের দামী শাড়ি। হালফ্যাশানের স্কার্ট। সালোয়ার কামিজ আর সুগন্ধের ঢল নামে। যেন হাওয়ায় ভাসা রঙ্গীন মেঘের দল বিন্দুর নাকের ডগা দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। ধরাছোঁওয়ার বাইরে। কেউ করুণার দৃষ্টিতে ওদের দেখছে কিন্তু জিনিস কিনছে না। খিদেয় পেটে মোচড় মারে। শিবু খিদে চেপে রাখে। সামনে পাতা পলিথিনের ওপর জিনিসসুদ্ধ ডাণ্ডা নামিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। দেখে বুনকে। লম্বা গলায় এদিক ওদিক তাকানো বিন্দুকে দেখে ওর আবার মুখ বার করা কচ্ছপের কথা মনে হয়।

বিক্রির আশায় বসে থেকে থেকে অনেক রাত। বাসনা ঝিমোচ্ছিল ঘরে বসে। ওরা ফেরামাত্র ঘুমচোখে জিজ্ঞেস করল—কিরে? বিক্রিবাটা কিছু হইল? পুলিশে তাড়া করছিল নি?

জিনিসপত্তর টোপলাকারে এখন শিবুর মাথার ওপর। ঘর অন্ধকার। তারই ভেতর দাদার মাথা থেকে বোঝা নামাতে নামাতে বিন্দু বলল—নাঃ কিচ্ছু না। একখান ম্যাক্সি বিক্রি হইছে। পূজার আগ দিয়া যা ঝঞ্ঝাট চলতাছে।

বাইরে ইটপাতা সরু জায়গায় মগের জলে পা ধুতে ধুতে শিবু বলল—মা খুব খিদা পাইছে। কি রান্না করছস?

ছেলেটার ক্ষুৎকাতর কথায় বাসনার বুকের ভেতর ঝড় ওঠে। সে উত্তর দিতে সাহস পায় না। মনে ভাবে শিবু যে তাকে পাঁচটাকার নোট আর সামান্য খুচরো দিয়ে গিয়েছিল তা কি সে ভুলে গেছে? ওই টাকায় দুইবেলা কি ছ'য়টা পেট ভরে? তবু তো বুদ্ধি খরচ কইর‍্যা দুইবেলার খাবার মজুত করছে সে। বাসনা হাতিপাতি করে দেশলাই বার করে। তারপর লম্ফ ধরায়। এতক্ষণ 'কেরাচিনি' খরচের ভয়ে সে লম্ফ ধরায় নি। ছেলেকে বোঝানোর ভঙ্গীতে বলতে থাকে—আর কয়ডা দিন

কষ্ট কর বাবা। একটা না একটা বিহিত হইবই। পাঁচটাকায় কি আর মাছ মাংস খাওন যায়? কথা বলতে বলতে কিছু একটা আশা নিয়ে বাসনা ভাতের হাড়ির ঢাকনা খোলে। এতক্ষণে জলে ভিজ্যা ভাতের খানিকটা বারবাড়ন্ত হইছে ভেবে নিশ্চিন্ত হয়। ছেলেমেয়ে দুইট্যা ওইবেলায় যা গোগ্রাসে ভাত গিলছে! খানিক বাধ্য হয়েই তাই নিজের পেটকে শাসন করতে হয়েছে।

তেলহীন ঘন্টের সঙ্গে ভেজা ভাত। হাপুস হুপুস শব্দ তুলে খাচ্ছিল ওরা। লম্ফের স্বল্প আলোয় তিন ছায়ামূর্তির নাচন। খুব অস্পষ্টভাবে বাসনার অনুভূতি করে তার চোখের সামনেও লম্ফকাঁপা আলোর মত কম্পমান জগৎ। স্থিরতা নেই। ঠিক যেমনটি ঘটেছিল আজ থেকে বাইশ তেইশ বছর আগে। মনে পড়ল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা। মুজিবহত্যার পর সেই বড়ো দিনগুলির কথা। কত আর বয়স তখন শিবুর? কেমন ছুইট্যা ছুইট্যা খেইল্যা বেড়াইত। দামাল ছিল কত। কয়েকমাসের বিন্দু তখন কোলে। সেই সময় একদিন শিবুর বাপ কোত্থেকে এসে বলল—বৌ এহানে আর থাকন যাইব না।

—ক্যান? চমকে উঠেছিল বাসনা।

—কইলাম তো থাকন যাইব না। আসলে এইডা এখন ভিন্ জাইতের দ্যাশ। আমরা তো অন্য জাইত। হেই জাইত্যের লাইগ্যা এদেশে আমাগো স্থান হইব না।

—ক্যান অ্যাদ্দিন কি এইডা ভিন জাইতের দ্যাশ ছিল না?

—তর মাথায় সেসব ঢুকব না। অ্যারে কয় রাজনীতি। হালচাল সুবিধার না।

—তাই বইল্যা পুর্বপুরুষের ভিটা ছাড়ুম? আমাগো নিজের বাড়িঘর ছাইড়্যা যামু? কিসের লাইগ্যা?

—আঃ জোরে জোরে কথা কস ক্যান? আস্তে ক। হারান পাল এরপর বেশ প্রাঞ্জল করে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল—ওপারে ভারত আমাগো জাইতের দ্যাশ। হেইখানে গ্যালে কেউ আমাগো তাড়াইতে পারব না। জাইত তো এক। মনের ধুক্‌পুকি লইয়া দিন কাটাইতে হইব না। মনে পড়ল বাসনার স্থিতির লোভে ভারতে এসে প্রায় না খেতে পেয়েই লোকটা অকালে প্রাণ দিল। স্বামীর দুঃখ জনক স্মৃতিরোমন্থনকালে অবধারিতভাবে এক সুখস্মৃতির বেড়াজালে বাসনা আবদ্ধ হয়ে যায়। গাছপালার সবুজ শ্যামলিমা, এমন কি ওদের ঘিরে পাখি প্রজাপতি কীটপতঙ্গ সব যেন কথা বলে ওঠে। নদীর কলকল জল, দিগন্তবিস্তৃত ধানক্ষেতে কৃষিরত চাষী। এপাশ ওপাশ পুকুর—তাতে চুনোপুঁটি বা কই কাঁকড়া ধরে আনন্দভোজন। সে কত দীর্ঘদিন নদী, সবুজ গাছপালা কিছু দেখে নি। বস্তির কাদা প্যাঁচ পেঁচে রাস্তা, কাঁচা নর্দমার দুর্গন্ধ, টালিছাওয়া অন্ধকার ঝুপড়িঘর যেন গরুর গোয়াল। কী সুখের লাইগ্যা যে শিবুর বাবা এহানে আইছিল? প্রশ্নটা কেন যেন ঘুরে ফিরে জর্জরিত করে তোলে বাসনাকে।

—এইডা কি কচু রাঁধছস্? অ্যার থিক্যা নুনভাত খাওয়ন ভাল।

শিবুর বিকৃত মুখের চিৎকৃত কথায় চমক লাগে বাসনার। হারান পাল প্রকৃতিকে নিয়ে অদৃশ্য হয়। সে কিছু বলবার আগেই শিবু বলে ওঠে—কাঁচালঙ্কা আছে নি? না তাও নাই?

ডালা হাতড়ে দুটো কাঁচালঙ্কা বার করে বাসনা। ছেলের পাতে ফেলে দিয়ে বলে—যখন যেমুন বেবস্তা। হে মানতেই হইব। চেঁচাইস না।

শিবুর তুলনায় বিন্দুর সহবত সহ্য অনেক বেশী। ভাবতে ভাবতে মেয়ের প্রতি একধরনের অনুকম্পামিশ্রিত ভাবাবেগে কাহিল হয় সে। লঙ্কায় কামড় দিয়ে শিবুর রাগরাগ ভাব কমে আসে। দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হল ওর মা। শিবু এক গরাস ভাত গিলে নিয়ে আপনমনেই যেন বলে ওঠে—ঈশ! আইজ যদি আমরা ভিন্ন জাইত হইতাম তয় এত কষ্ট এত ঝঞ্ঝাট কিছু পোহাইতে হইত না। অগো গায়ে সরকার হাত দেয় নাই।

—ক্যান রে শিবু? কি কস তুই? ভিন জাইত বইলাই তো নিজেগো দ্যাশ ছাইড়া আইছি। তো এহানে আবার ভিন জাইতের কথা ওঠে ক্যান?

শিবু ওর বাপ হারান পালের মতই ভেবে বসল যে তার বোকাসোকা মাকে রাজনীতির প্যাঁচপয়জার বোঝানো যাবে না। তাছাড়া দুর্বল বিদ্ধস্ত শরীরে ভাত আর কচুর ঘ্যাট পেটে পুরে কথা বলার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিল শিবু। সে সংক্ষেপে বলল—ও তুই বুঝবি না মা। সেসব বিস্তর কথা। ন্যাতাদের ভোটাভুটির পর্ব আছে না? সেই ভোটের জন্যি...

শিবু কানা তোলা অ্যালুমিনিয়ামের থালায় পান্তার অবশিষ্ট জলে শেষ চুমুক দিচ্ছিল। ঠিক এসময় একটা স্বপ্নদৃশ্য ওকে পর্যুদস্ত করে তুলল। গতবছর এসময় মানে পুজোর আগ দিয়ে দারুন বিক্রিবাটা। কিছু লাভের মুখ দেখেছিল ওরা। একদিন একটা গোটা ইলিশ আনা হয়েছিল। গরম ভাতের সঙ্গে সর্ষেবাটা ইলিশের ঝোল। স্বর্গীয় স্বাদ ওর জিভ ছুঁয়ে যায়। স্বাদু স্মৃতির আবেশবিভোর শিবুর মুখ ভরপেটেও লালায়িত হয়ে ওঠে।

সপার্ষদ চিমনিরাজ

পাঁচটা বাজতে না বাজতেই অশোককে কেউ যেন ঠেলা মেরে তুলে দিল। এক বিশেষ উত্তেজনা ভেতর থেকে ঠেলা মারছে বোঝা যাচ্ছে। আর এই এফেক্টের ফলেই নিজেকে আর কন্ট্রোলে রাখতে পারা যাচ্ছে না বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারল অশোক। টেবিলের ওপর গাদাগুচ্ছের ফাইলপত্তরের ওপর চোখ বুলিয়ে মনটা খুচ্‌খুচ্‌ করছে। তা সত্ত্বেও টেবিলের কোণায় রাখা হেলমেটটা তুলে নিল সে। অফিসিয়ালি পাঁচটায় ছুটি তবু সাড়ে সাতটা পর্যন্ত কাজ করা অশোকের অভ্যেস। দেরী করে বাড়ি ফেরার অভিযোগ এখন ছেড়ে দিয়েছে তৃষিতা। মনে হয় সেও অভ্যেসে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আসলে কো-অর্ডিনেশন ডিপার্টমেন্টের যে পদে অশোক আছে তাতে এলেবেলে কাজের ওজন বড্ড বেশী।

মাথায় হেলমেট চাপিয়ে স্কুটার মেইন রোডে উঠিয়েছে এমন সময় অশোক দেখল মালপত্তর বোঝাই ক'টা বিশালবপু লরি পুরো রাস্তা দখল করে দ্রুতগতিতে ছুটে আসছে। স্টার্ট বন্ধ করে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে। সামনে তাকাতেই কেন যেন রোজ দেখা অতিপরিচিত দৃশ্যের মানে বদলে যায়। কারখানার সুউচ্চ চিমনিগুলোর দু'চারটের মুখ দিয়ে লাল বেগ্‌নি আলোর হল্‌কা। কোনটার মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে কালো গলগলে ধোঁয়া। কেন কে জানে এ দৃশ্য অশোকের মনে একধরনের স্বস্তি ছড়িয়ে দিল। কতসময় এসব বর্জ্য পদার্থ পরিষ্কার আকাশে কৃত্রিম মেঘের সঞ্চার করে। ঘণ্টা কয়েক পরে ইলশেগুড়ি বৃষ্টির আকারে ঝরে পরে। কারখানা শহরে এই এক উৎপাত। যথেষ্ট বিরক্তিকর। অশোকের মনে বিরক্তির বদলে একধরনের আরামবোধ। ভাবছিল সে লৌহদানবের শ্বাসপ্রশ্বাস এখন এই মুহূর্ত পর্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে ওঠাপড়া করছে।

রাতের অন্ধকারে শুধু আলো আর আলো। গোটা কারখানা জুড়ে বৈদ্যুতিক আলোর মালা আর লাল বেগনি আগুনের হল্‌কায় তার দানবাকৃতি শরীর পরিবর্তিত হয়ে যায় কল্পলোকের ঝক্‌মকে রাজপ্রাসাদে।

অশোক যখন নতুন বিয়ের পর তৃষিতাকে এখানে এনেছিল রাতের অন্ধকারে কারখানার সৌন্দর্য ওকে একেবারে বিমুগ্ধ করে ফেলেছিল। অশোকের এখনও মনে আছে তৃষিতার উচ্চকিত চিৎকার, আরেব্বাস! কি দারুণ! হঠাৎ মনে হল অশোকের সেই উচ্ছল তৃষিতা এখন অচেনা গম্ভীর প্রকৃতির ভারিক্কি গিন্নী।

তেমুখো রাস্তার তিন কোণায় ব্যাঙ্ক পোস্টাপিস থানা ছাড়িয়ে পশ্চিমমুখো রাস্তা ধরল অশোক। আরো খানিকটা এগিয়ে বাঁদিকে মোড় নিলে জায়গাটার আভিজাত্য ধরা পড়ে যায়। ঝক্‌ঝকে চওড়া রাস্তার দুপাশে কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া গাছের সারি। রাস্তার বাঁদিকে বিশাল এলাকা নিয়ে বড় সাহেবদের বাংলো বাড়ি। তারপর একটু এগোলেই চিমনি গেস্টহাউস। গেস্টহাউসের উল্টোদিকে স্টাফ ক্লাব। স্কুটারের গতি কমিয়ে দিয়ে অশোক স্টাফ ক্লাবের ভেতর ঢুকে গেল। স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে নিচু হয়ে বসে তালা লাগালো। উঠে দাঁড়িয়ে লক্ষ্যে পড়ল ক্লাবচত্বর ফাঁকা। এখানে ওখানে দু'চারজন ঘুরঘুর করছে। চত্বরের বাঁ দিক ঘেঁষে বেশ খানিকটা জায়গাজুড়ে বড় বড় গাছের ঝাড়ে বন্য রূপ। গাঢ় সবুজ। কার উদ্যোগে এই বনসৃজন হয়েছিল কে জানে। পশ্চিমাকাশে হেলেপড়া লালরঙা গোলক। চারপাশে দিনশেষে অলৌকিক আলোর বিচ্ছুরণ। দেখতে দেখতে বারবার মন কেমন হয়ে যাচ্ছিল অশোকের। জীবনবৃক্ষের ঝরাপাতারা নিঃশব্দে উঠে আসছে মনের আনাচে কানাচে। আবার বোধহয় প্রাণ ফিরে পেতে চায়। অশোক খুব সম্ভব স্মৃতির অতলে ডুব দেয়।

এ বাই ডক্টর মুকার্জী কব আয়েগা? আর রঙ্গনাথনের খাঁটি দক্ষিণ ভারতীয় উচ্চারণে অশোকের অন্যমনস্কতা ভেঙ্গে গেল। উত্তর দেবার মুখে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাকিয়ে দেখল রঙ্গনাথনের পাশেই সদানন্দ গাঙ্গুলীর হাসিহাসি মুখ। সদানন্দ বরাবর আগ বাড়িয়ে কথা বলে। বলল সে—আরে ভাই ছে বাজে শুরু হোগা এহি তো পাতা থা। আব তো ছে বাজকে দশ মিনিট হো চুকা হ্যায়। পাতা নহী কিউ নহী আ রহে হ্যায়।

—হাম ভি তো ওহি সোচ রহা হ্যায়। কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে রঙ্গনাথন সামনের দিকে এগিয়ে যায়। সামনে টাক। পেছনে কিছু ফুরফুরে চুল। সদানন্দ সেই চুলে বিলি কাটতে কাটতে অশোককে বলল—তোমার কি মনে হচ্ছে অশোক? মুখার্জী কি এখানে কোন পরিবর্তন আনতে পারবেন?

—আগে থেকে কি করে বলা যাবে? তাকে তো এখনও চোখেই দেখিনি।

এখানে জমানো যাবে না বুঝতে পেরে সদানন্দ পাশ কাটালো। বছরখানেক আগের কথা। সদানন্দ গাড়ির ভেতর প্রচুর স্টিল প্লেট, টিউবলাইট আরও কি সব খুচখাচ্ জিনিস্ পত্তর হাতসাফাই করে নিয়ে আসছিল। ফ্যাক্টরি গেটে হাতে নাতে ধরা পড়েছিল। ঘটনাটা নিয়ে চিমনি শহরে ঢিঢি পড়ে গিয়েছিল। অবশ্যই ফিস্‌ফাস শব্দে। তার চাকরিটা থাকে কি যায় এ নিয়ে মহলে মহলে অনেক জল্পনা কল্পনা। শেষকালে সেবার উপযুক্ত অনেককে ডিঙ্গিয়ে সদানন্দর প্রমোশন হওয়াতে সবার মুখে কুলুপ পড়ে গিয়েছিল। তার প্রমোশন হল কিভাবে সে গুহ্যতথ্য অবশ্য কেউ জানতে পারে নি।

ভীড় বাড়ছে। যান্ত্রিক আওয়াজ তুলে ক্লাবচত্বরে ঢুকতে শুরু করেছে অসংখ্য গাড়ি আর স্কুটার। এতক্ষণ পাখিদের উচ্চকিত কলতানে জায়গাটি মুখর ছিল। মানুষের সম্মিলিত গুঞ্জনধ্বনি যন্ত্রধ্বনির আওয়াজে ওরা এখন চুপ। এখানে ওখানে মানুষের জটলাকৃত ভীড় এড়িয়ে অশোক অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালো। বুঝতে অসুবিধে নেই জটলাকৃত মানুষজন এখন নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডক্টর ভবেশ মুখার্জীর আলোচনায় ব্যস্ত। কেন যেন ফাঁকা বুলিতে অংশগ্রহণ করবার ইচ্ছে বা আবেগ কোনটাই সে নিজের ভেতর সঞ্চারিত করতে পারে না।

কপালের ওপর উড়েপড়া চুলগুলো হাত দিয়ে সরাতে সরাতে সামনে মানুষজন থেকে অশোকের চোখ সরে যায়। সে অন্যকিছু দেখতে থাকে। গেটের দুধারে দেবদারু গাছের সারি। মানুষের ভীড়ের ফাঁকফোঁকর গলে ক্লাবচত্বরের মাঝে গোলাকৃতি জায়গা থেকে লাল নীল হলুদ সাদা ফুলের উকিঝুঁকি। এখান থেকেই দৃশ্যমান বড় রাস্তায় কৃষ্ণচূড়ার মাথায় আগুনরঙা ঝলক্, রাধাচূড়ার মাথাভর্তি হলুদরঙা স্নিগ্ধতা। যেন আসন্ন সন্ধ্যায় ওরা আনতে চেয়েছে আলোকিত বর্ণময়তা। এসব প্রাকৃতিক বিন্যাসের ভেতর নতুন রঙ করা ঝল্‌মলে ক্লাববিল্ডিং। তবু সবকিছুর থেকে নিজেকে অস্পর্শ মনে হচ্ছিল। অনেক বছর আগে এমন সাজানো গোছানো ছিল না এ জায়গা। ছিল প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর একদল তরুণ এঞ্জিনীয়ারের সুপ্রচুর উৎসাহ আর উদ্দীপনা। দিনগুলোতে ছিল ঝক্‌ঝকে রদ্দুরের হাসিমুখ। আর এখন? অশোক কি জানে না এখন বাইরে ঝাড়ের লণ্ঠন আর ভেতরে চলছে ছুঁচোর কীর্তন। যে কোনদিন ধ্বংস নামবে। এ ধরনের কুচিন্তা মনে আসতেই অশোক কেমনতরো এক হৃদয় উদ্বেলকরা অনুরণনে কেঁপে যাচ্ছিল।

বিষণ্ণতাকে সঙ্গী করে চত্বরে মসৃণগতিতে একটি কন্টেসা ঢুকতে দেখল অশোক। দু'চারটে অ্যামবাসাডার ফিয়াট তার পেছু পেছু। গুঞ্জনধ্বনি স্তব্ধ। জটলাকৃত মানুষজন থম মেরে যায়। ওদের চোখ এখন স্বাপ্নিক কন্টেসার দিকে স্থির। সামনে দেবু মিত্র টাই-এর নট ঠিক করছিল। অশোককে দেখে বলল—আরে মিস্টার গুহ? কতক্ষণ? মুখার্জী সাহেব এসে গেলেন যে। চলুন ভেতরে বসিগে।

দেবু মিত্র পাকা দাবারু। দাবার কোন খোপে কি চাল চালতে হবে তা তার নখদর্পণে। আড়ালে সবাই ওকে দাবারু বলেই উল্লেখ করে। অশোক ঠিক করল ভীড় কমলে সে ভেতরে ঢুকবে। নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানের চৌকো মুখ টানটান স্মার্ট চেহারা চোখে পড়ল। ক্লাবদরজায় লম্বা সেলাম ঠুকে দারোয়ানের আপ্যায়িত করার ভঙ্গী চোখে পড়ল। কে একজন চেঁচিয়ে বলল—আসুন স্যার এইদিকে আসুন।

সার সার চেয়ার পাতা অডিটোরিয়ামে আজ গিজ্‌গিজে ভীড়। কর্মকর্তাদের দু'একজন খুব ব্যস্তভাবে স্টেজে ঢুকছে বেরিয়ে যাচ্ছে। মাইকওয়ালা দু'জন। তার মধ্যে একজন ওয়ান, টু থ্রি বলে টোকা দিয়ে মাইক ঠিক করছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই কখন যেন সময় পেছু হটতে থাকে। পুরোন স্মৃতির বুড়বুড়ি স্টেজকে দখল করে নিল। স্টেজের পেছন দিকের সাদা পর্দায় লাল শালুর কাপড়ের ওপর তুলো দিয়ে বড় বড় করে লেখা 'যাদবপুর অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন' জ্বলজ্বল করছে। রাত জেগে শালুর ওপর তুলো সেঁটেছে ওরা। টেবিলের ওপর অশোকের 'পাকরাশী' ব্র্যান্ডের হারমোনিয়াম। চারপাশ ঘিরে এক ঝাঁক তরুণ যুবক। গানে লীড দিচ্ছে অশোক। যন্ত্রদানবকে নিয়ে বিশ্বকবির লেখা ঝংকৃত সেই গানে পুরো অডিটোরিয়াম গম্‌গম্ করছে।

নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র।
তুমি চক্রমুখর মন্দ্রিত, তুমি বজ্রবহ্নিবন্দিত,
তব বস্তুবিশ্ব বক্ষদংশ, ধ্বংসবিকট দন্ত।।
....

সুরটা এত মাদকতাময় যে গানটা গাইলেই অশোকের বুকের ভেতর উথালপাথাল ভাবের ঢেউ খেলা করতে থাকে। সে চোখ বুজে হাঁটুতে তাল ঠুকছিল। গলায় গুণগুণ সুর। ঠিক এসময় প্রবল হাততালির শব্দে স্মৃতির স্বর্ণজাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ভবেশ মুখার্জী স্টেজে। বাচ্চা মেয়ের হাত থেকে ফুলের তোড়া, গলার মালা নেওয়া হয়ে গেল। টেবিলের ওপর আপ্যায়ন মালা ফুলের তোড়া রাখা হয়। পাশেই কাঁচের গ্লাসে ঢাকা জল। মুখার্জীর ইংরেজী উচ্চারণ বেশ বলিষ্ঠ। অশোক সামান্য উৎকর্ণ হল। আশ্চর্যরকম শব্দহীন অডিটোরিয়াম। মুখার্জীর স্বরে এক ধরনের দৃঢ়প্রত্যয়ের সুর প্রতিভাত হচ্ছে। বলে চলেছেন .... চিমনি শিল্প প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার গুরুদায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছি আমি। এ দায়িত্ব বড় কঠিন! তবে কর্তব্যে যাতে কোন গাফিলতি না হয় সে চেষ্টা আমাকে করে যেতে হবে। আপনাদের সামনে একটা প্রশ্ন রাখছি। বলতে পারেন এ সংস্থায় প্রতিবছর কেন কোটি কোটি টাকা লোকসান হয়? এ বিপুল ক্ষতিরোধ করা কি একেবারেই অসম্ভব? একসময় কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছিল এ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত সার। যার মূল্য কোনদিনই মূল্যহীন হবার নয়। অথচ কী দেখছি আমরা? ধুঁকতে ধুঁকতে নাভিশ্বাস উঠেছে এ সংস্থার। এর জন্য আমি দায়ী করব এ প্রতিষ্ঠানের কিছু উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে। তাদের অসৎ ক্রিয়াকর্ম, অর্থলোভে কনট্রাক্টরদের কাছ থেকে নিম্নমানের জিনিস কেনা, কাজের প্রতি অনিহা, সরকারি অর্থ ধ্বংস করে দেশবিদেশ সফর ইত্যাদি ক্রমবর্ধমান উৎপাতে আজ সে জরাজীর্ণ। নীচের মহলে এদের ল্যাজ ধরে অনেকে আবার নানারকম সুযোগসুবিধে নিয়ে থাকেন।

উল্লিখিত বাক্যটি উচ্চারিত হবামাত্র নিস্তব্ধ অডিটোরিয়াম খুক্‌খুক হাসির শব্দে কিছুটা হিল্লোলিত হয়ে ওঠে। রনেন অশোকের পাশে বসেছিল। অশোকের পিঠে হাত রেখে বলল—দারুন বলছেন কিন্তু। কি বলেন অশোকদা? ঘোরলাগা অশোক বলল—আঃ চুপ করে শোন না?

ভীড় ঠেলে স্কুটারের কাছে আসতে আসতে মনে হল অশোকের এর আগে আর কেউ কর্মকর্তাদের প্রতিটি দুষ্কর্মের খুঁটি-নাটি বিবরণ এভাবে জনসমক্ষে পেশ করে নি। ভদ্রলোকের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব তার বিষণ্ণ মনের ওপর যেন ঠাণ্ডা প্রলেপ—এমন একটা অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হল সে।

মাথার হেলমেট ঠিক করতে করতে রণেন এসে বলল—ভদ্রলোকের বক্তৃতার সময় আমি বিশেষ ক'জনের মুখ লক্ষ করছিলাম। শুকিয়ে চুন! কথা শুনে অশোক শব্দ করে হাসতে লাগল। চেহারায় ছোটখাটো হৃদয়ে বড় অতীন ঘোষ এগিয়ে এসে বলল—কি বুঝছেন দাদা? খুব বড় বড় বাতেলা তো ঝাড়লো—কাজে কদ্দুর এগোবে কে জানে?

—বেশ সিরিয়াস বলেই তো মনে হল। কিছুটা পরিবর্তন আনলেও আনতে পারেন।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে। অশোকের কথায় সাপোর্ট দিয়ে রণেন মাথা দোলালো। আরে দাদা দেখুন দেখুন দেবু মিত্তিরের কাণ্ড!

অশোক সতীনের দৃষ্টি বিনিময় হয়। সভা শেষ হতে দেবু মিত্রকে হন্তদন্ত হয়ে গ্রীনরুমে ঢুকতে দেখা গিয়েছিল। এখন সে মুখার্জীর পাশের জায়গাটি দখল করে হেঁ হেঁ করে হাসছে।

রণেন অতীন জমে গেছে। আলোচনায় মন নেই অশোকের। সে ভীড় কমার অপেক্ষায় ছিল। ভাবছিল এরকম একজন শক্তপোক্ত লোকের সাহায্য পেলে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে সংস্থাটিকে হয়ত বাঁচানো যাবে। এ ধরনের আশাপ্রদ ভাবনায় ভাবিত অশোক স্কুটারে পা রাখে।

গেস্ট হাউসের ভেতর বাইর জ্যোৎস্নালোকে মাখামাখি। না চাঁদের আলো নয়। চারদিকে বাহারি শেডের তলায় নিওন আলোর বিচ্ছুরণ মনে বিভ্রম জাগায়। মুখার্জীর আগমন উপলক্ষে আজ প্রাথমিক অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন। গেস্ট হাউসের দুদিকে বিশাল লন। লনের চারপাশ ঘিরে নানাবর্ণী ফুল, ছাঁটা হেজ। এককোণে কাঁঠালিচাঁপা গাছটি ফুলের ভারে অবনতা। বাতাসে তার মৃদু সুগন্ধ উড়ছে।

—মিস্টার মুখার্জী আসেন এদিকে। বসেন এইখানে। লনে পাতা একটি চেয়ার নির্দেশ করে বলল বৈষ্ণব দাস। এর আগেই দাসের কথনভঙ্গীর ভেতর স্মার্টনেসের

অভাব লক্ষ করেছিলেন মুখার্জী। সিনিয়ারমোস্ট কর্তাটির দিকে কেন কে জানে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন তিনি। এবং তাকিয়ে থাকতে থাকতেই দাসের সার্টের কলারের ফাঁক দিয়ে একটা তুলসী কাঠের মালার অবস্থান অবলোকন করলেন। সন্দেহ নেই মালাটি তাকে দারণ অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিল।

ওদিকে সামু ঘোষ এতক্ষণ অন্যান্যদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ছক্ আঁটছিল কি না বলা মুস্কিল। তবে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা দেখে মুখার্জীর সঙ্গে ভাব জমাতে এল।

—স্যার হাওডু য়ু ফিল দ্য সিচ্যুয়েশন?

ঘোষের বিনীত প্রশ্নের জবাবে মাথা হেলিয়ে মুখার্জী বললেন —দ্যাট্স ওকে।

কিছুক্ষণ খেজুড়ে আলাপের পর ঘোষকে এমন কিছু আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব বলে মনে হল না তার। ঘোষ দৃশ্যান্তরে যেতে লাঠি হাতে এগিয়ে এল রামবিলাশ শর্মা। ডায়বেটিসে ভুগে ভুগে কিছুটা জরাজীর্ণ। তার ওপর বাতের আক্রমণে কাবু। বক্তৃতার সময় গরহাজির ছিল।

—গুড ইভিনিং স্যার। আই অ্যাম আর বি শর্মা, জি.এম কনস্ট্রাকশন ডিপার্টমেন্ট।

—গ্ল্যাড টু মিট য়ু। বলার পরেই মুখার্জীর মুখ থেকে বেরিয়ে এল এক অবধারিত প্রশ্ন—য়ু আর লুকিং সিক্ মিস্টার শর্মা।

—আজ্ঞে কনস্ট্রাকশনের ব্যাপার নিয়ে বহুত ঝামেলা চলছে। তাই শরীরটা সামান্য ট্রাবল দিচ্ছে। হরদম সাইটে যাওয়া আসা। আর পেরে উঠছি না স্যার। মুখার্জীর পাশে বসা বৈষ্ণব দাসের মুখে ফুটে উঠেছে এক চিলতে হাসি। ট্যুর ট্যুর করে লোকটা পাগল একথা চিমনি'তে কে না জানে? লাঠি ভরসা করে কারণে অকারণে কত জায়গা যে চষেছে তার শেষ নেই। বেশ ক'বার বিদেশ ভ্রমণও হয়েছে তার।

নাম্বার থ্রিতে এসে ভালরকম হোঁচট খেলেন মুখার্জী। বেয়ারা ট্রেতে কোল্ড ড্রিঙ্কসের গ্লাস সাজিয়ে এদিকে আসছিল। আচমকা দেবু মিত্র বেয়ারার প্রায় বগলের তলা দিয়ে একটি গ্লাস উঠিয়ে মুখার্জীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল—নিন স্যার। আজ বড্ড গরম পড়েছে।

দেবু মিত্র কিভাবে আমন্ত্রণ যোগাড় করেছে কে জানে? এই বিশেষ পার্টিতে যোগদান করবার মত ধাপে সে এখনও ওঠে নি। তবে তার চেহারার হিরো হিরো ভাবটি বোদা মেরে যাওয়া মুখার্জীকে বেশ চাঙ্গা করে তুলল।

গেস্ট হাউসের দোতলা ব্যালকনির লালরঙের চৌখুপী দিয়ে ছিট্‌কে আসা আলোয় লনের ওপর আঁকিবুঁকি, অদূরে বড় বড় গাছের মাথায় জমাটবাঁধা নীলচে

অন্ধকার। এদের ফিস্‌ফাস কথাবর্তা, কৃত্রিম হাসি ধান্ধাসংক্রান্ত আলোচনায় স্বপ্নময় জায়গাটি ভারী হয়ে উঠেছে। গেস্টহাউসের ভেতর থেকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার প্রশান্ত সিন্‌হা বেরিয়ে এসেছে। সে মুখার্জী সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছে আসুন আপনারা। সব ভেতরে আসুন সব রেডি।

সিন্‌হার ওপর কর্তাব্যক্তিদের বিভিন্ন পার্টির সব রকম দায়িত্ব। হরেক পার্টিতে একই মেনুর পুনরাবৃত্তি। ফ্রায়েড রাইস, মাছ, মাংস, পনির, সব্জী-স্যালাড স্যুইট ডিস। আজ অবশ্য এর ওপর চপ কাটলেটের বোঝা। সঙ্গে বিদেশী পানীয়ের বন্দোবস্ত। সিন্‌হা এসব খাবার স্পর্শ করে না। তার গা গুলোয়। এখন আরো ঘন্টা দুয়েক মেক্যানিক্যাল হাসি ঝুলিয়ে আড্ডা দিতে হবে তাকে।

বিশাল ডাইনিং হলে টেবিলের ওপর থরে থরে সাজানো খাবার। হাতা হাতে দু'চারজন কর্মী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখার্জীকে অবশ্য নিজে হাতে খাবার আনতে হয় নি। কে যেন সাজানো খাবারের প্লেট ধরিয়ে দিয়েছে তার হাতে। মাছি ওড়া বসার মত মুখার্জীর চারপাশে কেউ বা থেমে আছে কেউ বা খাবার নিয়ে আসছে। খেতে খেতে দেখলেন মুখার্জী এক কোণায় দাঁড়িয়ে আমপাতা মুখের একটি হিলহিলে লোক প্লেট থেকে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। অচেনা, এক্কেবারে অচেনা। নিম্নপদের কেউ এখানে কল্কে পায় নি। উচ্চপদেরই কেউ হবে হয়ত! সামান্য ঔৎসুক্যবোধ তাকে ঠেলে দাঁড় করিয়ে দিল ভদ্রলোকটির সামনে। চিবোন ফ্রায়েড রাইস গিলে নিয়ে বললেন তিনি—এক্সকিউজ মি। হ্যাভ নট সিন য়ু বিফোর?

পরেশ দত্তর হাতের চামচ প্লেট আর মুখের মধ্যপথে স্থির। মুখে ফুটে উঠেছে উদ্ভাসিত হাসির আভাস। হাসি ভেঙ্গে সে বলে ওঠে—এই আর কি আমি অল্পই খাই। বৈষ্ণব দাস কোত্থেকে ছুটে এসেছে। পরেশ দত্তকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে বোঝা গেল।

—একটু জোরে বলবেন স্যার। উনি কানে একটু কম শুনেন। জি এম পরেশ দত্তর ডেজিগনেশন মেনে নিতে কষ্টবোধ হল মুখার্জীর। এত গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট। কানে হিয়ারিং এইড লাগাতে পারেন না? সত্যি বলতে কি কারো সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে উবে যায়। কাদের দেখছেন তিনি? এরা সব এই প্রখ্যাত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। সম্ভ্রম আসা দূরে থাক এক ধরনের অনুকম্পাবোধে মুখার্জীর শরীর মন বিবশ হতে থাকে। মানুষের চেহারা বা কথাবার্তা অনেক সময় অন্তর্নিহিত প্রতিভার পরিচয় বহন করে না জানেন তিনি। তবে কি কোন সুপ্ত প্রতিভার আকস্মিক স্ফূরণে সহসা এরা মঞ্চে উপস্থিত।

ভোম্বল চন্দ্র ফাইভ ফিফ্‌টি ফাইভে টান দিতে দিতে ঘরে ঢুকল। খাবারে মনোনিবেশকারী লোকজনের দিকে বিক্ষিপ্ত দৃষ্টিপাত করতে করতে সোজা

মুখার্জীর মুখোমুখি। সামান্য কাঁধ ঝাঁকালো। দু আঙ্গুলের মাঝে সিগারেট চেপে রেখে সে অবস্থাতেই কায়দা করে হাত জুড়লো।

— নমস্কার স্যার, আপনার মূল্যবান বক্তৃতা শোনবার সৌভাগ্য হয়ে উঠলো না। অ্যাম স্যরি। কাজে কোলকাতায় ছিলাম। আজ সন্ধ্যের ট্রেনে ফিরেছি।

ভোমল চন্দ্র আগামী দশ তারিখে তার বিবাহ বার্ষিকীর কেনাকাটা করতে সস্ত্রীক কোলকাতা ট্যুরে গিয়েছিল সেকথা অবশ্য জানার কথা নয় নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানের। তবে আজকাল এই চিমনি শহরে কিছু স্পাইয়ের আবির্ভাব হয়েছে। আসল খবরগুলো ঠিক বার করে ফেলে। যেমন ভোম্বল নামটা সে গোপনই রাখতে চেয়েছিল—কোন দুষ্টগ্রহের লোক খোঁচা মেরে নামটা বার করে ফেলেছে। অবশ্য এই চাকুমচুকুম খবরগুলোর ওজন নেই। স্ফুলিঙ্গের মত উড়ে উঠে মিলিয়ে যায়—জানা আছে ভোম্বলের।

লম্বা, ফর্সা, স্মার্ট ভোম্বলকে দেখামাত্র মুখার্জীর দম আটকানো ভাবটা উধাও হয়ে যায়। কিছুক্ষণ বাদ বৈষ্ণব দাস লক্ষ করল মুখার্জী এবং ভোম্বল নন্‌স্টপ কথা বলে চলেছে।

কেমিক্যালের বিভাস চ্যাটার্জী এখানে নেই। সে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং নিতে হায়দ্রাবাদ গেছে। বিভাস সত্যিকথা খুব দাপটের সঙ্গে বলতে পারে। তাকে দেখলে মুখার্জীর কি প্রতিক্রিয়া হত কে জানে? এখানে প্রায় সবাই জানে বিভাসের দাপট বা ওভার স্মার্টনেসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার মেধা। সিঁড়ি টপকাবার কাজে তার এসব কোয়ালিটি কাজে লেগেছে বলা যেতে পারে।

মাসখানেক বাদে ভবেশ মুখার্জীর সারকুলার অফিসের ঘরে ঘরে আলোড়ন তুলে দিল। রাজনৈতিক ভাষায় যাকে বলা হয় তৃণমূল প্রায় সেই অর্থেই শেকড়ের গোড়া ধরে টান মেরেছেন মুখার্জী। নিয়মের দড়িতে বাঁধতে চেয়েছেন কর্মীদের। ঠিক টাইমে অফিস আসতে হবে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া ট্যুরে যাওয়া চলবে না। প্লেনে ওড়াউড়ি আপাতত বন্ধ ইত্যাদি ইত্যাদি।

ম্রিয়মানভাব উধাও। অশোকের প্রতিটি দিন এখন চরম উত্তেজনার মধ্যে কাটছে। ক্যাটালিস্ট প্ল্যান্টের রিভ্যামপিং বিষয়ের কিছু জটিল কাজ এখনও হয়ে ওঠে নি। এতদিনের উদাস মন এখন উৎসাহে চেগে উঠেছে। অফিসের সুদীর্ঘ করিডোরে ফাইল-পত্তর নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল অশোক, মুখার্জীর এলেম আছে। দু'দুটো বড় প্রোজেক্টের কাজ আটকে ছিল। কাজদুটো মুখার্জীর চেষ্টায় ক্লিয়ার হয়েছে। এখান থেকেই হবে। অফিসে এখন অভূতপূর্ব শৃঙ্খলা। যারা পান চিবোতে চিবোতে বেলা ন'টায় আসত তারা সাড়ে সাতটার সাইরেন বাজতে না বাজতেই অফিসে হাজির। লাঞ্চটাইমে বেরিয়ে দিবানিদ্রা সম্পূর্ণ করে বেলা সাড়ে

তিনটেয় আসা কোন লোককে এখন খুঁজে পাওয়া যাবে না। সব বেলা দু'টোর ভেতর হুজুরে হাজির। সর্বত্র একটা সন্ত্রস্ত ভাব।

গান ভুলতে বসেছিল অশোক। এখন গুণগুণ সুর ভাঁজছে। রণেন পেছন থেকে অশোকের কাঁধে হাত রাখে। তাকিয়ে দেখল রণেন হাসছে। খুশীর হাসি। সে মাত্র কয়েক বছর হল এসংস্থায় ঢুকেছে। দারুন অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার। উজ্জ্বল চোখ। এখন ধুয়ে ধুয়ে জল খাচ্ছে। মোটে তেল দেবার ধাত নেই। প্রমোশন আটকে আছে। নেহাত গবেট বিশ্বেশ্বর জানা ওর ওপর বসে ছড়ি ঘোরাচ্ছে।

হাসতে হাসতেই বলল—একেবারে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরী আইন। কর্তারা সব চিমনিতে বসে খেয়াল করেছেন কি? টাকা-পয়সার নয়ছয়টা বন্ধ করতে পারলে একটা কাজের কাজ হবে।

নয়ছয় শব্দটি সহসা এক গা জ্বালানো স্মৃতির মাঝে টেনে নিয়ে যায় অশোককে। মাসকয় আগের কথা। কি একটা কাজের জন্য সে বৈষ্ণব দাসের ঘরে বসেছিল। এমন সময় চীফ এঞ্জিনীয়ার নটবর সিং-এর পি.এ. রমেন তিওয়ারী কী একটা সই করাবার জন্য বৈষ্ণব দাসের দিকে নোটসিট এগিয়ে দিল। নোটসিটে চোখ বুলিয়ে দাস বলল—সিংজী রাঁচিতে ট্যুরে যাবেন তো ট্রেনে বা বাসে যেতে দোষ কি?

তিওয়ারীর মুখে অমায়িক হাসি। সে বোঝানোর ভঙ্গীতে বলেছিল —স্যার বুঝছেন কি না সিংজীর প্রাইভেট কারের কিছু পার্টস বোদল করতে হোবে। রাঁচিতে উনার বাড়ি। উখানে উনার জানাশোনা গাড়ি মেরামতির ওয়ার্কশপ আছে। বুঝছেন কি না নিজের গাড়িতে গেলে কম্পানির পয়সায় এক ঢিলে দো পাখি মারা যাবে।

—ওঃ তাই বলুন।

তিওয়ারীকে অমায়িক হাসি ফেরৎ দিয়ে কৃতার্থ মুখে দাস নোটসিটে সই করে দিয়েছিল। সামান্য ঘটনা হলেও সংস্থার প্রকৃত চিত্রটি তৎক্ষণাৎ ধরা পড়েছিল অশোকের চোখে। অবশ্য রাঘববোয়ালেরা যেভাবে সরকারি অর্থ লুটেপুটে খাচ্ছে তা বহুবছর আগে থেকেই জানা। কোথাও যেন কোন বাঁধন নেই। চোখ মেলে চেয়ে দেখা আর মনের ভেতর হিস্‌হিস্ রাগ পুষে রাখা ছাড়া আর কিছু করার নেই তা কি জানে না অশোক? অনেকদিন বাদ আজ আবহাওয়া বদলের পূর্বাভাসে বেশ হাল্‌কা মেজাজে অফিসঘরে ঢুকলো সে।

আরামে আয়েসে ভবেশ মুখার্জীর চোখ বুজে আসছিল। চারপাশে তোষামদের দোলায় তার চেতনায় এক সুখকর অনুভূতির আবেশ। সন্ধ্যে হতেই হুইস্কির নেশায় তার ঝিম্‌ধরা মন ঝিঁ ঝিঁ পোকার তান শুনতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। বাংলোর চারপাশ ঘিরে যা গাছ আর বাগান!

মুখার্জীর হুইস্কির নেশা নতুন নয়। বহুদিনের। এই ঘোর ঘোর আচ্ছন্নভাব যেন উড়ে চলা। সেন্টার টেবিলের ওপর অবহেলাভরে পড়ে আছে সুচেতার চিঠি। এখনও খোলা হয় নি। স্ত্রীর চিঠি এখন আর কোন রোমান্স জাগায় না। খুললেই প্যানপ্যানানি জানা কথা। এলোমেলো ভাবনা পাক খায়। দাস, দত্ত, চন্দ্র, শর্মারা চোখের সামনে ভেসে উঠেই ফের তলিয়ে যাচ্ছে। এদের তুলনায় নিজেকে কেমন যেন হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে যায়।

নাঃ দেখাই যাক কি লিখেছে বিড়বিড় করতে করতে চিঠি খোলেন মুখার্জী। যা ভাবা হচ্ছিল তাই—শুরু থেকেই বকবক। এক্ষুনি লাখ চারেক টাকার বন্দোবস্ত কর। বাড়ি তৈরির ভার দিয়ে দিব্যি বাইরে বাইরে কাটাচ্ছ। খুব তো বাহারি বাড়ির শখ। মাকরানা স্টোন, কুডাপ্পা পাথর, কোটা মার্বেল, সিনথেটিক টাইল্‌সের দাম জানো? স্ত্রীর ওপর রাগ হয় না। রাগ হয় নিজের ওপর। সুখী সুখী মনে খিচ ধরে। রাজা সাজার মেয়াদ আর মাত্র দু'বছর। বাড়ি কমপ্লিট করতে নাহোক পনেরো লাখ টাকার ধাক্কা। আসল ব্যাপার হচ্ছে লোনাপুরীতে পাশের প্লটের ব্যবসায়ী নিতাই ধরের বাড়ির সঙ্গে কমপিটিশন দিতে গিয়ে হালৎ খারাপ। ছেলেমেয়ের দুন আর দার্জিলিং স্কুল অনেক টাকা টেনে নিয়েছে। ধুর ধুর সারাজীবন কেরিয়ারের পেছনে ছুটে হলটা কি? আক্ষেপ আসে মনে। নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলতে থাকেন মুখার্জী।

মুখার্জীকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। রিটায়ারের মুখে সব হর্তাকর্তাদেরই ভবিষ্যৎ আশ্রয়স্থানের জন্য ভয়ানক টেন্‌শন। তাই চারমাথা এক হলেই সব আলোচনা ছাপিয়ে ওঠে কোলকাতার অর্ধসমাপ্ত বা সমাপ্ত বাড়ির তথ্যসমৃদ্ধ বৈচিত্র্যময় শব্দসম্ভার।

পরেশ দত্তর ঘরে সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর একদিন টানটান করে পাতা বাড়ির নক্সা দেখে অশোক চম্‌কে উঠেছিল।

দত্ত বলছিল—যাই বলুক মিস্টার দাস আপনার বাড়ির ডিজাইন আমার বাড়ির থেকে অনেক ভাল। গিন্নীর তো প্ল্যানই পছন্দ হচ্ছে না। আপনার এস্টিমেট কত পড়ল?

—এস্টিমেট নিয়া ভাবতাছেন? এখন কেনেন দেখি লোনাপুরীতে একখান পাঁচকাঠার প্লট? বাড়ি আর করতে হইব না। হুঃ।

আত্মতৃপ্তিতে বৈষ্ণব দাসের মুখ উজ্জ্বল দেখায়।

ঘরে এয়ারকন্ডিশনারের মৃদু গোঁ গোঁ আওয়াজ। টেবিলের একধারে ফাইলপত্তরের স্তূপ। বাড়িসংক্রান্ত আলোচনা চলতেই থাকে।

ঠাণ্ডা ঘরে দাঁড়িয়েও বিন্‌বিন্ ঘাম। বেশ জোরে অশোক বলে উঠেছিল—চলি স্যার।

—আরে হল কি আপনার? বসেন বসেন।

দত্ত আচমকা সিরিয়াস—আপনাকে যে প্লট প্ল্যান ফাইনালাইজ করতে দিয়েছিলাম তার কি হল? ইক্যুইপমেন্ট লিস্টটা কি তৈরি করেছেন?

—আজ্ঞে সে সম্বন্ধেই তো আপনাকে কিছু বলার আছে। আর একদিন সময় লাগবে বলে মনে হচ্ছে। আপনাকে একবার দেখে দিতে হবে স্যার।

দত্তর সঙ্গে কথা বলার সময় অশোকের স্বরগ্রাম আপনা থেকেই অদ্ভুত উচ্চতাপ্রাপ্ত হয়। দাসের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। দত্তর আমপাতা মুখে হাসি ফোটে। —আপনার মত আরও কিছু লোক যদি এ অরগানাইজেশনে থাকত তাহলে এর ছবি পাল্টে যেত।

—কিছু লোক তো নিশ্চয় আছে। তবে তাদের নীটফল শূন্য। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিক্ততা প্রকাশ না করে পারে না অশোক। সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব দাসের তাৎক্ষণিক জবাব যথেষ্ট অনুতপ্ত শোনায়।

—এটা সত্যি যে আপনার প্রতি সুবিচার হয় নাই। দেখি এবার অ্যাসেসমেন্টে কি করা যায়।

এক ঝুড়ি লাল লাল লিচুর সামনে ভবেশ মুখার্জীর মুগ্ধ দৃষ্টি স্থির। —বলেন আপনার বাগানের লিচু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। খেয়ে দেখবেন।

—চা না কফি?

—কিচ্ছু না স্যার। অফিসের কাজ পড়ে রয়েছে।

—ছুটির দিনেও কাজ?

—কি করব? সমস্যা তো লেগেই রয়েছে। অবশ্য এখন তো আপনি এসে গেছেন।

ভারী কাঁচের চশমার ভেতর থেকে মুখার্জীর মুখের ভাব আন্দাজে তৎপর হয় সামু ঘোষ। তার অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারের যা বহর তাতে ভগবানকে ধরবার সহস্র পথ জানা না থাকলে এখানে ওঠা আর সম্ভব হত না। তা ভালই জানে সামু ঘোষ। খবর পেয়েছে ঘোষ, ভোম্বল চন্দ্র নাকি লতানো গাছের মত লতিয়ে আছে মুখার্জী নামক স্তম্ভে। মুখার্জীর সিগারেট আর হুইস্কির ভার স্বইচ্ছেয় আপন কাঁধে তুলে নিয়েছে চন্দ্র। সবার সামনেই যখন চন্দ্র মুখার্জীর সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে, সামু ঘোষের বুকটা সেই সঙ্গে পুড়তে থাকে। চন্দ্রের উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়াকর্ম ধরতে পারলেও মুখার্জীর তার প্রতি এক আলাদা দুর্বলতা আছে। তবে বিভাস চ্যাটার্জী লোকটাকে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারা যাচ্ছে না। অতিরিক্ত আদর্শবাদী বলে মনে হয়। এখনকার দিনে আবার আদর্শ কি? যদিও নিজে চেয়ারম্যানের পদে

তবু চ্যাটার্জীর অতিরিক্ত গাম্ভীর্য অহংবোধই বলা যেতে পারে। দেখলে কেমন যেন সামান্য হীনমন্যতাবোধ অনুভূত হয় মুখার্জীর।

একজন ক্লায়েন্ট এসে বসে আছে অশোকের ঘরে। দুটো প্রোজেক্টের কাজ এখান থেকেই হবে জানতে পেরে এখন থেকেই বিভিন্ন পার্টির লোকজন এসে ধর্ণা দিচ্ছে। ভদ্রলোককে অপেক্ষা করতে বলে বেরিয়ে পড়ল অশোক। পরেশ দত্তর ঘরের সামনে এসে থমকাল। নেই, বৈষ্ণব দাস, চন্দ্র, শর্মা, রাজাসাহেব সবার ঘর বন্ধ। গেল কোথায় এরা? হতবাক অশোক বিভাসের ঘরে ঢোকে। যদিও কার্যক্ষেত্রে বিভাসের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ নেই।

ওকে দেখে বিভাস হাসতে শুরু করেছে।

—গরুখোঁজা খুঁজলেন তো? কেউ নেই। জরুরী প্রয়োজনে সব বম্বে বরোদা দিল্লী উড়ে গেছে। একমাত্র আর.বি.শর্মা অফিসের কাজ নিয়ে তার ছেলে ভর্তির ব্যাপারে বেনারস গেছে ট্রেনে।

—মানে? আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।

—থাকেন কোথায়? কত কাণ্ড হয়ে গেল। ডক্টর মুখার্জী এখন অন্যসুরে কথা বলছেন। চিমনি শহর নাকি মনুষ্যবাসের অযোগ্য। এখন থেকে উনি বম্বে বরোদা, দিল্লী থেকে কাজ চালাবেন। ফাইভ স্টার হোটেলে বসে কোম্পানির পয়সা ওড়াবেন।

বয়সে কাছাকাছি। ডেজিগনেশনের দিক থেকে অনেক জুনিয়ার অশোক। তার সামনে এসব খোলাখুলি আলোচনা ঠিক হচ্ছে না। আসলে আগাগোড়া সৎ কর্মনিষ্ঠ অশোককে দেখলে আপনা থেকেই এসে যায় আন্তরিকতা। পদমর্যাদার কথা তখন আর মনে থাকে না।

বিস্ময়ের ঘোর ভাঙ্গতে খানিকটা সময় যায় অশোকের। বলে — এই যে কত কি করবেন বলেছিলেন। কিছু কিছু অ্যাকশনও তো নিয়েছিলেন।

— তা নিয়েছিলেন। তবে শেষরক্ষা আর হল কোথায়? খানিক চুপ করে থেকে বিভাস ফের বলল, আরও খবর আছে। চিমনি অরগানাইজেশনকে টুকরো টুকরো করে ফেলবার সিদ্ধান্ত পাকা। অলরেডি কাজ শুরু হয়ে গেছে। নবীনপুরা সহদেবপুরা প্রোজেক্টের কাজ দুটো এখান থেকে হচ্ছে না। অবশ্যই বড় বড় লোকদের স্বার্থের খেলা আছে এতে। যেরকম শুরু হয়েছে তাতে আর দু'চার বছরের মধ্যে এসংস্থার চিহ্ন থাকবে না।

খাবি খেতে খেতে অশোক বলল—তা তা আপনি কিছু করতে পারলেন না?

—আমার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ অশোক। তাছাড়া এদের মধ্যে আমি জুনিয়ার মোস্ট। যা বলবার বলেছি। ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে একা লড়াই করা যায় নাকি?

অশোক কথা বলে না। সে চুপচাপ বসে থাকে। ভুলে যায় যে সে তার ঘরে একজন ভদ্রলোককে বসিয়ে এসেছে।

বিভাস অন্যকথা ভাবছে। অশোককে দেখে তার পরাজিত সৈনিকের মুখচ্ছবির কথা মনে পড়ে। চুলে পাক ধরেছে। মুখে দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতার মরচে ধরা ছাপ। বিমর্ষ। অথচ এমনটি হবার কথা ছিল না।

প্রোজেক্টের কাজ এখান থেকে হবে না—চিমনি অরগানাইজেশনকে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হচ্ছে এ খবরে শহর আলোড়িত হয়ে উঠেছে। শহরের এখানে ওখানে জটলা। তবে ক্ষীণ আশা অনেকেই পোষণ করছে। স্থানীয় জনসাধারণের চাপে ম্যানেজমেন্ট হয়ত হার স্বীকার করবে। রাজনীতির ধ্বজাধারী মাফিয়ারা পথের মোড়ে মোড়ে বক্তৃতা জমায়। সেখানে দম আটকানো ভীড়। শ্রোতাদের চোখেমুখে উদগ্র আশা। আচমকা কোন মন্ত্রবলে তারা অদৃশ্য হয়। তবে কি আসন্ন ঝড়ের আগে সব চুপচাপ? না ঝড় ওঠে না। সবাই বোঝে ম্যানেজমেন্টের কাছে টাকা খেয়ে মাফিয়ারা গা ঢাকা দিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে কয়েকশো কর্মীকে চালান করে দেওয়া হয় দিল্লী, বম্বে, বরোদাতে।

কাজের চাপ নেই। অশোক মনমরা অবস্থায় বসে ছিল অফিসঘরে। অর্থহীন মনে হচ্ছে অফিস যাওয়া আসা। তবে কোলকাতার এক নামী কোম্পানিতে একটা বড়সড় কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। দিন দুই আগে বৈষ্ণব দাস পরেশ দত্ত কোলকাতায় গেছে তদারকিতে। সঙ্গে লক্ষ্মণ ঝা পরেশ দত্তর পি.এ গেছে। দু'একটা চিঠি লিখতে হবে। প্যাড টেনে চিঠি লেখা শুরু করেছে এমন সময় 'গুরুদেব' আওয়াজ শুনে মুখ তুলে তাকাল অশোক। লক্ষ্মণ ঝা পান চিবোচ্ছে। পানচিবুনো ছাড়া পুরো বাঙ্গালি। কোলকাতার ছেলে। অশোককে দারুন রেসপেক্ট করে। একবার তাকে দিয়ে অশোকের কোলকাতা ট্যুরের টিকিট কাটানো হয়েছিল। বলেছিল অশোক,

—এ সির দরকার নেই।. শুধু ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটলেই হবে।

—কেন দাদা ঠাণ্ডা লাগবার বাতিক আছে নাকি?

—না না শুধু শুধু একগাদা পয়সা খরচা।

—সে তো কোম্পানি বিয়ার করবে। আপনার কি?

—কেন কোম্পানির পয়সা কি আমাদের নয়? এই অশোক গুহই র‍্যাশনালাইজেশন প্রোজেক্টে সালফিউরিক অ্যাসিড প্ল্যান্টের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিল। কোটি কোটি টাকার কাজ। কনট্র্যাকটরদের হাত থেকে সুপ্রচুর টাকা নেবার সুযোগ সে কিভাবে নস্যাৎ করেছিল তা নিয়ে ক'দিন মস্ত আলোচনা চলেছিল চিমনিতে। এসব ইমপ্যাক্টের দরুনই হয়ত ঝা তাকে 'গুরুদেব' বলে সম্বোধিত করে।

—কি ব্যাপার? এর মধ্যে এসে গেলেন?

কথার উত্তর না দিয়ে ঝা সামনের চেয়ারে বসে পড়ে। হাসছে। — আরে দাদা কী এত সব কাজ করছেন? কাজটাজ সব হাওয়া। খবর শুনেছেন? সামনের সপ্তাহে অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে। এখানেই হবে। কর্তারা সব উড়ে আসবেন।

—ওসব কথা থাক। কোলকাতায় যে কাজের জন্য যাওয়া হল তার কি খবর?

দেশলাই-এর কাঠি দিয়ে কান খোঁচাতে খোঁচাতে সে বলল, খবর হচ্ছে লোনাপুরীতে দুই কর্তা তাদের বাড়ি তৈরির ব্যাপারে কোলকাতা অফিসের দুটো গাড়ি নিয়ে চড়কির মত সারা শহর পাক দিচ্ছে। স্যারদের এখন সময় নেই। সময় হলে ডেকে পাঠাবেন। এসব হচ্ছে অলিখিত নিয়ম। এদের পরিবার তথা আত্মীয়স্বজনের জন্য শেয়ালদা ডানকুনি মায় গোবরডাঙা পর্যন্ত বেআইনিভাবে অফিসের গাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়।

শহর ধ্বংসের মুখে হলে কি হয় 'অ্যাসেসমেন্ট' সপ্তাহে অফিসে চাপা উত্তেজনা। ঘরে ঘরে কানাকানি। কে উঠবে কে থাকবে নানা জল্পনা কল্পনা। চিমনি টুকরো হওয়ার ঘটনাটি আপাততঃ চাপা পড়ে যায়।

নির্বিঘ্নে অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হয়। হাওয়ার বেগে ছড়িয়ে পড়ে সভার খুঁটিনাটি বিবরণ। অশোক রণেন এদের নাম নাকি এক আধবার উঠেছিল। সে সময় ভোম্বল চন্দ্র স্বভাবজাত তৎপরতায় নাকি বলেছিল—স্যার কোম্পানিতে এদের কোন কনট্রিবিউশন নেই বরং ....। ওর ল্যাজধরা প্রবাল সাহার গুণগানে মুখর হয়েছিল চন্দ্র। ফুট কেটেছিল বৈষ্ণব দাস। সাধে কি ওরা বছরের পর বছর এক জায়গায় বসে আছে?

মিটিং চলাকালীন রামবিলাস শর্মা চমৎকারভাবে এক ঘুম দিয়েছিল সে খবর পর্যন্ত পৌঁছে যায় সবার কানে। বিভাসকে সময় বুঝে জগদ্দলপুরে পাঠানো হয়েছিল। ব্যাপারটা নাকি ইচ্ছাকৃত।

বৈষ্ণব দাস বাদে সবার হাতে তরল পানীয়। এ সমস্ত ম্লেচ্ছ জিনিস থেকে দূরে থাকে দাস। অ্যাসেসমেন্টের দরুন এদের খাটাখাটুনি হয় প্রচুর। সে ধারণা করেই গেস্টহাউসে প্রতিবারই জাঁকজমক পার্টির ব্যবস্থা থাকে। টেবিলে অপর্যাপ্ত খাদ্যবস্তু। ফুলের চারপাশে মৌমাছির ঘুরঘুরের মত মুখার্জীর চারপাশে মনুষ্যরূপী মৌমাছির দল। কবে যেন এরা মুখার্জীর খুব কাছের লোক হয়ে গেছে। এদের দেখলে মুখার্জীর আর বিরক্তিবোধ হয় না। তবে ভোম্বলের ব্যাপার আলাদা। সে স্বদেশে বিদেশে মুখার্জীর নিত্যসহচর। সত্যিকথা বলতে কি মুখার্জী জয়েন করবার মাস চারেকের মধ্যেই ফরেন যাবার হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। বিদেশী কোলাবরেশনে কাজ হচ্ছে বলেই হয়তবা। লাভক্ষতির হিসেবে দেখা যাচ্ছে ক্ষতির পরিমাণ

বেড়েই চলেছে। মুখার্জীর চোখে নেশার ঘোর। দেবু মিত্র ঘুরঘুর করছে। সে এখন আপার ক্লাসের লোক। নিন স্যার বলে মুখার্জীর প্লেটে মুরগীর ঠ্যাং তুলে দিল। ঠ্যাং চিবোতে চিবোতে চন্দ্রকে বলছিলেন মুখার্জী, বাড়িটা প্রায় কমপ্লিট। এখন ফিনিশিং টাচ চলছে। দেখে এসো। দুর্দান্ত হয়েছে। নেশার ঘোর বা খুশীর ঘোরেই হোক প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন মুখার্জী।

লাঞ্চ টাইমে অফিস থেকে বেরোতে গিয়ে অশোক দেখল আকাশ জুড়ে থমথমে মেঘ। যাবে কি যাবে না ভাবতে ভাবতে চটরপটর বৃষ্টি শুরু হল। অশোক স্কুটার রাখবার শেডের তলায় গিয়ে দাঁড়ায়। সামনে বৃষ্টির কুয়াশায় সব কিছু ধূসর। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই আচমকা যৌবনের স্মৃতি মোহগ্রস্ত করে তুলল অশোককে। মেসে এক গুচ্ছ যুবকের দাপাদাপি। এরকম কোন বর্ষাভেজা দিনে—এই ঝিরঝিরঝির বাতাসে কি গান ভেসে আসে। ধনঞ্জয়ের মনমাতান গানটা গেয়ে সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখা।

ভেতরে ভ্রমরগুঞ্জন। যেন ফুলের সুবাসে তাদের আনন্দধ্বনি। বিহ্বল হয়ে যায় অশোক। স্বপ্ন স্বপ্ন আর স্বপ্ন। নেহেরু থেকে আরম্ভ করে কত বড় বড় ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি এ শহরে উৎসব বয়ে এনেছে। চোখের সামনে স্বপ্নের জানলাগুলি একে একে বন্ধ হয়ে গেল। শ্মশানের ওপর কিছু অর্থগৃধ্রু লোকেদের নৃত্য শুরু হয়েছে। বুকের ভেতর টুপটাপ রক্তক্ষরণের আওয়াজ হতে থাকে অশোকের। স্কুটার ঠেলতে ঠেলতে কাকভেজা রনেন শেডের তলায় ঢুকল। স্কুটার দাঁড় করিয়ে চশমা খুলল। রুমাল দিয়ে কাঁচ মুছতে মুছতে বলল—অসময়ে কিরকম বৃষ্টি দেখেছেন? চশমা লাগিয়ে নিয়ে বলল রণেন—দেখলেন দাদা এদের কাণ্ড? আমি দু'দুটো জায়গায় ইন্টারভিউ দিয়েছি। যেখানে পাব সেখানেই চলে যাব। এখানে আর নয়।

—যাও। যাও। আমাদের বয়স হয়েছে। ইচ্ছে করলে তো আর রিস্ক নিতে পারি না। তোমাদের বয়স অল্প। পথ খোলা।

রণেনের গলায় ক্ষোভ ঝরে পড়ে—যাও বা টিমটিম করে জ্বলছিল মুখার্জী এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিল সবকিছু। লোকটা দুর্দান্ত ধড়িবাজ। আচমকা বৃষ্টি ধরে যাওয়াতে ছায়াছায়া ভাব কেটে যায়। মেঘ ভেঙ্গে হালকা রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। অশোক রণেন প্রায় একসঙ্গেই স্কুটারে স্টার্ট দিল।

দুই কন্যা

অসম্ভব উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল লীলাময়ীকে। খোলা জানলায় চোখ রেখে বলে উঠলেন—বাঃ জায়গাটা তো বেশ সুন্দর রে! দূরে পাহাড়। চারপাশে কতরকম গাছপালায় সবুজ। তোদের বাগানে নানা ধরনের ফুলগাছও দেখলাম। ইংরেজীতে যাকে বলে সিনিকবিউটি দারুন!

দেখছিল আয়তী মধ্যপঞ্চাশ উত্তীর্ণা সুধাময়ীর ত্বক যত্নের অভাবে শিথিল। শরীর কৃশ অথচ তার চোখ বহন করছে যৌবনের দীপ্তি। ঝক্‌ঝকে দৃষ্টি। বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে মেয়ের সাজানো ঘরের দিকে তাকিয়েছেন। সোফাসেট, কার্পেট, শোকেসে ভিন্নধরনের মূর্তি ও পুতুল যা লীলাময়ী আগে কখনো দেখেন নি। ফুলদানীতে টাটকা ফুলের স্তবক। তৃপ্তির হাসি লীলাময়ীর মুখে। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—কেমন জামাই জোগাড় করেছি বল? তোর বাবা যা গেঁতো। ওকে দিয়ে কিচ্ছু হত না।

— বাবার মত লোক আমি দেখি নি মা। তোমার প্রতি তার ভালবাসায় কোন খাদ নেই।

প্রচন্ড রেগে গেছিলেন লীলাময়ী— তোরা সব এক। শুধু বাবার দিকে ঝোঁক। কেন সোমেনের ভালবাসায় কি খাদ মেশানো?

আয়তী চুপ। আসলে ও তো জানে একথার কোন উত্তর তার জানা নেই। মা'র মন ঘুরিয়ে দেবার জন্য বলে উঠেছে — চা খাবে?

—কী যে বলিস! জামাই আসুক অফিস থেকে। তখন সবাই মিলে চা খাওয়া যাবে।

—ফিরতে ওর অনেক দেরী মা। অতক্ষণ নেশা দমিয়ে রাখা তোমার আমার কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এখানে আসার পর এতক্ষণবাদে যেন মেয়ের দিকে তাকাবার অবকাশ পেলেন লীলাময়ী। তাকিয়েই আছেন। মেয়ের চোখের তলায় গভীর কালি, শুকনো মুখ তাকে বিচলিত করে তুলছে বুঝতে অসুবিধে হয় নি আয়তীর। সে দেখতে পায় ক্রমশঃ দুশ্চিন্তার ছাপ সরে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠেছে এক অপার্থিব হাসির রেখা। হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করলেন—কিরে সুখবর আছে বলতে নেই বুঝি? আজকাল কী যে সব দেরীটেরী করে বাচ্চা হয় আমার বাপু একটুও ভাল লাগে না।

মা'র মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছিল আয়তী। কিছুক্ষনের জন্য দূর পাহাড়ে সীমাবদ্ধ ছিল তার দৃষ্টি। তারপর ঝটিতি উঠে দাঁড়িয়ে সে বলেছে—চা করে আনি কেমন?

চাভর্তি কাপদুটো সেন্টার টেবলে রেখে লম্বা সোফায় বসে থাকা লীলাময়ীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছে আয়তী। লীলাময়ীর দু'হাত আপনা থেকে মেয়ের মাথায় চলাচল শুরু করেছে। আদর খেতে খেতে আয়তী পৌঁছে যায় তার পুতুল খেলার বয়সে। উঠে বসেছে আয়তি। চায়ে চুমুক দিতে দিতে দুষ্টু হাসি ছল্‌কে উঠেছে চোখের তারায়। বলেছে সে—তুমি কি আজকাল ইংরেজী শিখছ মা? সিনিক্ বিউটি শব্দদুটি শুনলাম যেন।

—ওই দ্যাখ সেসব কথা বলতে ভুলেই গেছি। তোর বিয়ের পরই তো উনি রিটায়ার করলেন। তারপর থেকে তোর বাবার একমাত্র ছাত্রী আমি। রোজ ওর কাছে ইংরেজী শিখছি। খুব মন দিয়ে আজকাল ট্র্যানশ্লেসন করছি। খোকনের ছেলে বুবুকে ইংরেজীতে চিঠি লিখেছি তা জানিস?

—কনগ্র্যাচুলেশন মা। চালিয়ে যাও। খোকন আয়তীর বড়দা। মেক্যানিক্যাল এঞ্জিনীয়ার। এখন চাকরিসূত্রে বম্বেতে। পড়াশোনা চালাবার জন্য এককালে অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল তাকে। বইখাতা নেই ভদ্রগোছের জামাকাপড় নেই—নিয়মিত মাইনে দেওয়া সাধ্যের অতীত ছিল। আয়তীর শিক্ষক পিতা শৈলেনবাবু সারাদিন স্কুলে ছাত্র ঠেঙ্গিয়ে সকাল সন্ধ্যা টিউশনি করে সংসার চালাবার রসদ যোগাড়ে ব্যস্ত থাকতেন। ছেলেমেয়ের দিকে তেমনভাবে তাকাবার সময় ছিল না তার। আয়তীর স্মৃতির ঘরে ছেলেবেলার কদমছাঁট চুলওয়ালা দাদার রুগ্ন চেহারাটা ভেসে ওঠে। তার নিজেরই বা কি ছিল? কলেজে পড়বার সময় সম্বল ছিল দু'খানা সস্তার ছাপার শাড়ি। অতিরিক্ত ব্যবহারে সে দুটো শাড়ির অনেক জায়গা পিঁজে গিয়েছিল। ছিঁড়ে যাওয়া অংশ সাবধানে সূঁচের ফোঁড় চালিয়ে মেরামতিতে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছিল আয়তী। শাড়িতে কষে মাড় দিয়ে লোহার ইস্ত্রি চালিয়ে ভদ্রস্থ করে তবে কলেজে যাওয়া। মনে পড়ে যায় আরও অনেককিছু। চটিজোড়াতে তাপ্পি দিয়ে দিয়ে এমন অবস্থা হয়েছিল যে চেনা মুচির কাছে চটি এগিয়ে দিতে সে অবাকচোখে খানিকক্ষণ তাকিয়েছিল আয়তীর দিকে। তারপর চটিটা হাতে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে বলেছিল—ইটার মেরামুতি আর চলবে নি দিদিমুনি। ইবারে একজোড়া নতুন চটি কেনেন। সেসব হার্ডেল রেস পেরিয়ে এখন ওরা শক্ত জমিতে পা রেখেছে।

কতদিন এখানে থাকা হবে জিজ্ঞেস করাতে আয়তীকে বলে উঠেছিলেন লীলাময়ী—তোর বাবাকে এখনও চিনিস নি। শতেক ঝামেলা করে তবে দশদিনের ছুটি পাওয়া গেছে। বুড়োর অনেক জ্বালা।

—উহুঃ বুড়ো বলা ঠিক হল না। বাবার মাথার সব চুল কালো। তোমার সব সাদা।

কৃত্রিম রাগ ঝল্‌সে উঠেছে লীলাময়ীর চোখে মুখে—তোর বাবাই তোদের সব। আমি তো ফ্যালনা।

রাগ গিলতে মুহূর্ত সময় লাগে লীলাময়ীর। তারপর স্মৃতিচারণে ঢুকে পড়েন। অল্পবয়সে কী যে চমৎকার দেখতে ছিলাম। না হোক কোন রাজরাজরার ঘরে বিয়ে হতো। তা না—পড়াশোনায় ভাল এক গরিব ঘরের ছাত্রের হাতে আমাকে তুলে দিলেন বাবা। অজ পাড়াগাঁয়ে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে নদী থেকে জল আনা, কাঠের উনুনে রান্না করা, মাটির ঘর নিকোন—কী কষ্টটাই না গেছে। তোর বাবা তো আবার রোজগারের চেষ্টায় থাকতেন কোলকাতায়। সুযোগ বুঝে তোর ঠাকুমা কি কম অত্যাচার করেছেন আমার ওপর?

লীলাময়ীর অতীত অভিজ্ঞতার কাহিনী অনেকবার শোনা। অথচ ফেলে আসা যুগের সামাজিক ধ্যানধারণা, মেয়েদের নিষ্পেষিত জীবনের কথকতা লীলাময়ীর বলার ভঙ্গীতে পুরোন বা একঘেয়ে হয়ে যায় না। থেমে যাওয়া লীলাময়ীকে খেই ধরে দেয় আয়তী—দাদুটা কী বোকা ছিলেন তাই না মা?—তা আর বলতে! সে সময় কোলকাতায় বাবা যে একটা বিরাট বাড়ি ভাড়া করে রেখেছিলেন তা তো তুই জানিস। বছরের বেশীর ভাগ সময় সেই বাড়িতে থাকা হত আমাদের। তোর দাদু ছিলেন বিয়াল্লিশ মৌজার জমিদার। খাজনাপত্তর আদায় বা জমিদারি সংক্রান্ত কাজে যখন গ্রামে যেতেন বাবা তখন মাঝে মধ্যে আমাদেরও যাওয়া হত। তো তার তিনছেলেকে বাবা হিন্দুস্কুলে ভর্তি করে দিলেন।

লীলাময়ী থামেন। কী যেন চিন্তা করেন। তারপর বলতে থাকেন—সে এক উত্তাল যুগ। দেশজুড়ে স্বদেশী হাওয়া। খবরের কাগজে গরম গরম খবর। নেতাজী সুভাষের বক্তৃতা, গান্ধীজীর অসহযোগ অন্দোলন এখানে ওখানে দেশভক্ত যুবকদের আত্মদান—কাগজ এলেই বাড়িতে ভাইবোনদের ভেতর মারপিট শুরু হত। কে আগে পড়বে তাই নিয়ে। শান্তি সুনীতি, বীণা দাস প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় আরও অনেক মেয়েরা সব অন্দরমহলের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসেছে। সেসব খবর পড়ে উথালপাথাল হত মন। ইচ্ছে হত ছুটে যাই বাইরে—দেশের জন্য কিছু করি। কিন্তু সে সময় বেশীর ভাগ পরিবারে মেয়েদের শাসনের দড়ি এত শক্ত ছিল যে সে বাঁধন খোলা ছিল সাধ্যের অতীত।

—স্কুলে পড়বার জন্য দাদুর পা ধরে কেঁদেছিলে না তুমি? মেয়ের কথায় লীলাময়ীর উদাসী মুখে হাসি ছল্‌কায়।

—তোর মনে আছে দেখছি। তবে শোন—তখন দেশের আকাশে বাতাসে যেমন স্বদেশী হাওয়া তেমনি মেয়েদের স্কুল কলেজে পড়বার এক নতুন জোয়ার।

লীলশিক্ষা প্রসারে ব্রাহ্মসমাজ এগিয়ে এসেছে। মেয়েদের বন্ধ দরজা একটু একটু নিয়ে উন্মুক্ত হচ্ছে। বেথুন স্কুল থেকে কিছুটা দূরে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের ওপর ছিল মিমাদের বাড়ি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেয়েদের স্কুলে যাওয়া আসা দেখতাম। বুক ভেঙে যেত। মনে হত রক্ত ঝরছে।

—তারপর?

—আমার কান্নাকটিতে কোন গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি বাবা। শেষে স্কুলে ভর্তি হবার জন্য টানা দুদিন উপোস দিলাম। তখন কিছুটা নরম হয়ে শরৎ, বঙ্কিম, রবিঠাকুরের একগাদা বই কিনে দিলেন বাবা। স্কুলে পড়ার ইচ্ছেকে এইভাবে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছিল। আর তারপর থেকেই পাত্রখোঁজা শুরু হল।

—তাই বাবার মত বিদ্বান, বুদ্ধিমান সুন্দর একজন লোককে তুমি পেয়ে গেলে।

মেয়ের মাথায় এলোমেলো চুলগুলি ঠিক করে দিতে দিতে বলে উঠেছিলেন লীলাময়ী—তোর ছেলেমানুষি স্বভাব এখনও গেল না দেখছি। জায়গাটা তোর কেমন লাগছে রে?

—ভাল লাগছে বললে খুব কম বলা হবে মা। এই যে নানা রকমের পাখি, রকমারি গাছপালা, দূরের পাহাড় সব মিলিয়ে একটা মায়াময় জগৎ থেকে থেকে উধাও করে দেয় মনটাকে—উড়িয়ে নিয়ে যায় কল্পরাজ্যে।

জানে আয়তী তার মা'র সঞ্চিত অভিজ্ঞতার বিপুল বৈচিত্র্য। প্রাক্‌স্বাধীনতা স্বাধীনতার পরবর্তী যুগ—সমাজের পরিবর্তনশীল পদক্ষেপ লীলাময়ীর চোখের সামনে ঘটেছে। কত ঘাতপ্রতিঘাত, কত ওঠানামা, সমাজবিবর্তনের নানা ছবি হাতাখুন্তি নেড়ে সংসারে ডুবে থেকেও লীলাময়ী তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তুলে রেখেছেন মনের ক্যামেরায়। এসব গল্প ফুরোয় না। মা বলে মেয়ে শোনে। সময় কখন কিভাবে গড়িয়ে যায় কেউ টের পায় না।

বিদেশ বিভূঁয়ে পছন্দমত বই পাওয়া যাবে কি না সেসব ভেবে বাক্সে কিছু বই ভরে এনেছেন লীলাময়ী। বরাবরের অভ্যেসমত বইহাতে শুয়ে পড়েছেন। রাতের সব কাজ সেরেটেরে ঘরে ঢুকল আয়তী। মুখ বাড়িয়ে বলল—কি বই মা?

—মনসামঙ্গলকাব্য। ময়মনসিংহগীতিকাও এনেছি। পড়বি নাকি? চাঁদ সদাগর। সোনাইদীঘির বৃত্তান্ত কি তোর ভাল লাগবে? এসব বই...উঠে বসেছেন লীলাময়ী...একটু ধ্যান দিয়ে পড়তে হয়। বাড়িতে যা কাজ! তেমন নিশ্চিন্ত সময় কই? সেজন্য এখানে নিয়ে আসা।

আয়তী জানলার ধারে গিয়ে পর্দা টেনেটুনে ঠিকঠাক করল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ক্রীম ঘষে মুখে। তারপর খাটে উঠে মার পাশে শুয়ে পড়ে।

বইপড়া থেকে মন উঠে গেল লীলাময়ীর। বলে ওঠেন—ওকিরে? এখানে কেন? অনেক রাত হয়েছে। জামাই কি ভাববে বলত? যা ওঘরে।

—কী যে বল! এঘরটা তো আমার। তোমার জামাই শোয় ওই পুবদিকের ঘরে।

লীলাময়ীর চোখে অনেক ফাঁক ফোঁকর ধরা পড়ছে তা ভালই অনুমান করেছে আয়তী। মেয়ে জামাইয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়া ভাব তিনি লক্ষ করেন নি নাকি? একারণেই হয়ত তার কথা বলার ভেতর আতঙ্কের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মা'র ভাবনাকে হাল্কা করবার জন্য সোমেনের চরিত্র ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছে আয়তী। সে বলতে থাকে,—এককথায় তোমার জামাই কিন্তু দারুন ভদ্রলোক মা। একবার জ্বর এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে এখানকার নামী ডাক্তার উপস্থিত। ওষুধ টনিক ফলমূল সব শিয়রে মজুদ। কোন জিনিসের দরকার হলে মুখ খুলতে না খুলতে এসে যায়। খুব সিনসিয়ার। এজন্য অফিসে ওর খুব সুনাম। সেই কোন ভোরে উঠে অফিস যায় তো, তাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হয় ওকে।

লীলাময়ীর মুখে নিশ্চিন্তভাব ফিরে এসেছে কি না দেখে নিয়ে সে ফের বলেছিল—আসলে রাতজেগে বইপড়ার অভ্যেসটি তো তোমার কাছ থেকে রপ্ত করেছি। খানিকটা সেজন্যই এ ব্যবস্থা।

—বুঝলাম—তা তোর শরীর এত খারাপ হয়েছে কেন বললি না তো।

—তুমি যা ভেবে বসেছ তা নয় মা। আসলে অনেকদিন বাদে আমায় দেখলে তো—তাই রোগা মনে হচ্ছে।

আয়তীর বলার ভঙ্গীর ভেতর কিছু একটা গোপন করবার প্রয়াস কি টের পেয়েছিলেন লীলাময়ী? সেকারণেই হয়ত খুব অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলে উঠেছিলেন—একখানা ঠাকুরের আসন পাতবার জায়গা হল না তোর?

—হাসালে মা। তুমি নিজে কত পুজো আর্চ্চা কর যে আমায় বলছ? তোমার ভগবান কে তা আমি জানি না বুঝি?

খুশী ওপচানো হাসিতে মুহূর্তে লীলাময়ীর মুখ থেকে চিন্তাক্লিষ্ট মালিন্য মুছে যেতে দেখেছে আয়তী।

—রবিঠাকুরের কথা বলছিস?

—এতে সন্দেহ আছে?

—খুব শিশুবয়স থেকে লীলাময়ীর আবৃত্তি শোনায় অভ্যস্ত আয়তীরা সবাই। রবিঠাকুরের অসংখ্য কবিতা তার কণ্ঠস্থ। সংসারের শতেক কাজে হাত চালাতে চালাতে অনায়াসভঙ্গীতে আবৃত্তি করে যান সোনার তরী, সেঁজুতি, কথা ও কাহিনী, নবজাতকের নানা কবিতা। কতদিন হয়ে গেছে মা'র আবৃত্তি শোনা হয় নি। আয়তী আবৃত্তি শোনবার জন্য আব্দার ধরে তার মা'র কাছে। লীলাময়ীর মুখের আলো দৃষ্টি এড়ায় না আয়তীর। তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে উপাসনার ভঙ্গী। শুরু করেন

স্ত্রী শিময়ী—ক্ষত যত ক্ষতি যত মিছে হতে মিছে/নিমেষের কুশাঙ্কুর পড়ে রবে করে/কী হল না, কী পেলে না, কে তব শোধে নি দেনা/সে সকলি মরীচিকা আলাইবে পিছে...

—পূজা থেকে বললে?

—হ্যাঁ তিনশো বত্রিশ নম্বর।

—এত মনে থাকে তোমার অথচ বল কিছুই মনে থাকে না।

—আজকাল মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়। তবে ছোটবয়সে একবার যা পড়তাম তাই ছেপে যেত মনে।

—তার মানে শ্রুতিধর ছিলে তুমি?

—লোকে তো তাই বলে। লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লীলাময়ী বলতে থাকেন—তাহলে তোর বাবাকে প্রথম জব্দ করার ঘটনাটা বলি। স্কুল কলেজে পড়ি নি। তাই হয়ত মূর্খ ভাবতেন আমাকে। তা হঠাৎ একদিন পরীক্ষার খাতায় ছাত্র ছাত্রীরা কি লেখে দেখবার ভীষণ আগ্রহ হল। উঁচু ক্লাসের খাতা। দেখতে গিয়ে তোর বাবার কাছে ধরা পড়ে গেলাম। ও ভয়ানক রেগে গিয়ে...

—এক দাবড়ি দিলেন এই তো?

—ঠিক বলেছিস। তখন আমি যে মূর্খ নই তা প্রমাণ করবার জন্য কালিদাসের মেঘদূতম্ কাব্য থেকে বলতে শুরু করলাম—কশ্চিৎকাণ্ডা বিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ/শাপানাস্তাংগমিত...থামছি না দেখে তোর বাবা তো হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন আমার মুখের দিকে।

—তারপর?

—তারপর থেকে শর্ত হল।

—কি শর্ত?

—প্রতিমাসে আমার পছন্দমত একটি বই কিনে দিতে হবে। তা কিনে দিয়েছেন শর্ত অনুযায়ী।

—জানি সে কথা। তাইতে দু'আলমারি বই উপচে পড়ছে।

ঘুমিয়ে পড়েছেন লীলাময়ী। আয়তীর চোখে ঘুম নেই। এখানে আসার পর থেকে রাতজাগা নিয়ম হয়ে গিয়েছে তার। বুকের ভেতর গভীর শূন্যতা। চারপাশে প্রকৃতির এত রঙ! অথচ সর্বক্ষণের জন্য মনে হচ্ছে জীবনের সব রঙ ধুয়ে যাচ্ছে, মুছে যাচ্ছে সব সবুজ। উদাসীন, নির্বিকার অদ্ভুত এই মানুষটির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা যাবে কি? ভাবনাটা চাপা দিতে গিয়েও চাপা দেওয়া গেল না। আয়তী কি জানে না তার চোখেমুখে গোটা অবয়বে ফুটে উঠেছে এক গভীর যন্ত্রণাবোধের ছাপ!

দিন দশ কেটে যাবার পর আয়তীর বাবা শৈলেনবাবুর একখানা চিঠি এল লীলাময়ীর নামে। চিঠিতে চোখ বোলাতে না বোলাতেই লীলাময়ীকে আঁচলে গিঠ দিয়ে চিঠিটি বেঁধে ফেলতে দেখে সন্দেহ হয়েছিল আয়তীর। চিঠি কেড়ে নিয়ে দেখেছে এবয়সেও শৈলেনবাবু তাঁর স্ত্রীকে 'প্রিয়তমাসু' লিখে সম্বোধিত করেছেন। বোঝে আয়তী লীলাময়ীর লজ্জা পাওয়া স্বাভাবিক। তবু সে তার মাকে বলেছে—গর্বের ব্যাপার নিয়ে তুমি লজ্জা পাচ্ছ? ভেবে দেখো এবয়সেও বাবার মনের জমিতে কত রঙ! সে চিঠি থেকে ক'টা লাইন জোরে জোরে পড়ে শোনাতে থাকে লীলাময়ীকে।—চিঠি পাইবামাত্র চলিয়া আসিবার ব্যবস্থা করিবে। সময় পার করিয়া দিলে তোমার শখের কদম্বগাছটি কাটিয়া ফেলিব। বেশী দেরী করিলে ভালবাসার গোলাপ গাছটির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

—আঃ থাম। খোলা দরজা দিয়ে সোমেনকে ঢুকতে দেখে বিব্রতবোধ করেছেন লীলাময়ী। খানিকটা নার্ভাসনেসে আক্রান্ত লীলাময়ী বলে উঠেছেন—তোমার শ্বশুরমশায়ের চিঠি এসেছে। তাড়াতাড়ি যেতে লিখেছেন।

—বলুন কবে টিকিট কাটব?

—যত তাড়াতড়ি সম্ভব।

—ঠিক আছে।

সোমেনের নিরুত্তাপ ব্যবহার লীলাময়ীকে ক্ষুণ্ণ করছে বুঝতে পেরে আয়তী প্রসঙ্গান্তরে যায়—খাবে না? আজ শনিবার। হাফছুটি। এদিন বেলাবেলি আসে সোমেন। সে বলে—নাঃ আজ ক্যান্টিনে খেয়ে এসেছি।

—তাহলে চা দেব কি?

কব্জী উল্টে ঘড়ি দেখে নিয়ে বলল সোমেন—তিনটে বাজে। চারটে বাজলে চা দিও। বলেই সে তার ঘরে ঢুকে যায়। লীলাময়ী এতক্ষণ তার জামাইকে দেখছিলেন এবার মেয়ের দিকে ফিরে বললেন—ইংরেজী রূপকথা স্লিপিং বিউটির কথা মনে পড়ছে। তাতে কোন এক মন্দপরীর অভিশাপ পণ্ড করতে এক সদাশয় পরী রাজ্যসুদ্ধ লোককে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল না?

হ্যাঁ। সবাই স্ট্যাচু হয়ে গিয়েছিল। এখানে শুধু আমার বর স্ট্যাচু তাই তো?

জোরে হেসে উঠে মা'র দু'র্ভাবনা দূর করতে চেয়েছে আয়তী। ঠিক চারটের সময় চা নিয়ে আয়তী সোমেনের ঘরে ঢুকলো।

—কাগজ আসে নি?

—না। এলে দিয়ে যাব।

কোলকাতা থেকে বহুদূরে এখানে কাগজ আসে বিকেলে। জানে আয়তী, কাগজ পড়া হয়ে গেলে ভদ্রলোক বাগানে খানিকক্ষণ পায়চারি করবে। তারপর

বই নিয়ে বিছানায় আশ্রয় নেবে। সময়ে খেয়ে নিয়ে ঘুমের ভেতর তলিয়ে যাবে। বিয়ের পর মাসদুয়েকের ভেতরই যেন বিবাহিত জীবনের সব চাওয়া পাওয়া নিঃশেষিত হয়ে গেছে। বয়স বেশী হলে অনেকের চোখে একটা নির্বিকার উদাসীনতার পর্দা পড়ে যায়। সোমেনের চোখে ঠিক তেমনি এক নির্বিকার উদাসীনতার পর্দা সাঁটা। অথচ লোকটার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া যায় না। ভদ্র, মার্জিত, কর্তব্যপরায়ণ লোকের ওপর কেমনভাবে রাগ প্রকাশ করা যায় তা জানে না আয়তী। খানিকটা অভিমানভরেই আয়তী আলাদা ঘরের বন্দোবস্ত করাতে সোমেন বলেছিল,

—ওহো তোমার অসুবিধে হচ্ছে এঘরে?

—কেন কিছু মনে করলে নাকি?

—এতে মনে করার কি আছে?

কথা ওখানেই শেষ। তাদের সম্পর্কের এই অদ্ভুত অবস্থা লীলাময়ীকে যে আতঙ্কিত করে তুলছিল তার জেরার ধরন দেখেই বুঝতে পারা গিয়েছিল।—হ্যাঁরে সোমেনের কি আগের ভালবাসাটাসা ছিল নাকি?

—কী যে সব অলীক কল্পনা কর। মনে ভেবেছে সে অন্য একটি মেয়েকে ভালবেসে যদি এমন নির্বিকার হত তবে সে জীবনের স্বাদ এই বিস্বাদ দিনগত পাপক্ষয়ের থেকে হয়ত বেশী মোহময় হত। নিজের বাবার কথা মনে পড়েছে আয়তীর। দারিদ্রের কষাঘাতে জরাজীর্ণ তবু মাস্টার শৈলেনবাবুর ভেতর প্রাণ প্রাচুর্যের অভাব ছিল না। টিউশনির টাকা পেয়ে একবার সবার জন্য সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালির টিকিট কিনে এনেছিলেন। ছেলেমেয়ের থাবাথাবিতে লীলাময়ী তার অত্যন্ত প্রিয়খাবার চানাচুরের স্বাদগ্রহণে প্রায়শঃই অকৃতকার্য হতেন। রাতের গভীরে শৈলেনবাবু স্ত্রীর হাতে চানাচুরের প্যাকেট দিতে গিয়ে সেই অকালকুষ্মাণ্ডদের হাতে বামালসুদ্ধ ধরা পড়েছিলেন। তাই নিয়ে কত হাসাহাসি, কত মজা। আয়তী স্থির জানে লীলীময়ী বুঝতে পেরেছেন প্রাচুর্যের মধ্যে খাঁ খাঁ শূন্যতা ঘুরপাক খাচ্ছে। লীলাময়ী বলেন—তোদের দুজনকে দুদণ্ড একসঙ্গে বসে গল্প করতে দেখি নি।

—ভেবো না মা। আমার ভাল ঘুম হচ্ছে কি না, শরীর ঠিক আছে কি না এসব খোঁজখবর সবসময় নেয়। অনেকদিন সিনেমা দেখিনি বলাতে পরদিনই সিনেমার টিকিট কেটে এনেছিল।

—খুব চিন্তা হচ্ছে আমার।

—ওঃ তুমি শুধু তোমার জামাইকে নিয়ে পড়ে আছো। আজ সকালে কী একটা অদ্ভুত স্বপ্নের কথা বলছিলে না?

মুখ থেকে মেঘ সরে যায়। হাসিমুখে বলে ওঠেন লীলাময়ী—তোকে বলেই বলছি। অন্য কেউ শুনলে পাগল ভাববে আমাকে। স্কুলে যাবার স্বপ্ন যে কতবার দেখেছি তার ঠিক নেই। তো এখানে আসার ক'দিন আগে স্বপ্নে দেখলাম বইখাতা নিয়ে স্কুলে যাচ্ছি। কত যেন অল্পবয়স আমার। এমন সময় কে যেন সামনে দাঁড়িয়ে বলল—লীলা তুমি স্কুলে যাচ্ছ? খুব খুশী হোলাম।

বলতে বলতে আবেগবিহ্বল লীলাময়ীর গলা ধরে যায়। বলেন—তাকিয়ে দেখি স্বয়ং রবিঠাকুর দাঁড়িয়ে। শুয়ে পড়ে তাঁর পা স্পর্শ করে প্রণাম করলাম। এমন কি তার ফুলো পা অনুভবে এসেছিল। চোখ উপচে জল পড়ছে। আঁচল দিয়ে জল মোছেন লীলাময়ী। জীবনসন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে অল্পবয়সের বঞ্চনার কথা ভোলা সহজ হচ্ছে না তা বুঝেছে আয়তী।

এখানে বর্ষা শেষ হতেই শীত তার ঝাঁপি খোলে। শরীরে শিরশিরানি অনুভব আসতেই গায়ে আঁচল জড়িয়ে নিল আয়তী। অন্ধকার এসে কখন সোনালি আলোর পর্দাকে মুছে দিয়েছে টের পাওয়া যায় নি। বাগানের দক্ষিণ কোণায় পুষ্পিত হাসনুহানার সৌরভে ঘর ম ম করছে। আবছা অন্ধকারেও খোলা জানলা দিয়ে চোখে পড়ছে দূর পাহাড়ের অস্পষ্ট নীলচে ছায়ামূর্তি। রাস্তায় টুপটুপ্ আলো জ্বলে উঠতে দেখল আয়তী। মনে হল বাইরের প্রকৃতি ঠিক তেমনি আছে। বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। মন ভারী। আশী ছুঁই ছুঁই লীলাময়ীর কথা ভেবে। তার জীবনদীপ আর ক'দিনই বা জ্বলবে। যেটুকু খবরাখবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে ধরা যাচ্ছে তার সলতে ফুরিয়ে এসেছে। এই দীর্ঘবছরে তার নিজেরও কি পরিবর্তন হয় নি? আয়তীর মুখে এক চিলতে হাসি খেলা করে। কারুকাজ করা ড্রেসিং টেবলের আয়না তাকে জানিয়ে দিয়েছে তার বিষাদগ্রস্ত মুখে বয়সের আঁচড়। কুঞ্চিত কেশদামে রূপোলী রেখা। তবে আয়তীর ছোটবোন শ্যামলী তাকে বলেছে তার চোখে নাকি এখনো মাখানো আছে স্বপ্নকল্পনার অঞ্জন। খুব যে ভুল বলেছে তা মনে হয় নি আয়তীর। সে ছাড়া আর কেউ কি জানে এক সুন্দর স্বপ্ন তাকে সর্বদা উজ্জীবিত করে রাখে—বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগায়। ঠিক এমন এক স্বর্ণাভ সুরভিত সন্ধ্যায় এখানে এসেছিলেন না লীলাময়ী? কবে কোন ফাঁকে বছরগুলো টুক্‌টুক্ করে হারিয়ে গেল ঠিক বোঝা গেল না।

ডোরবেলের টুং টাং আওয়াজে স্মৃতিসমুদ্রে অবগাহনরত আয়তীর ঘোর ভাঙ্গে। আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। সুইচ অন করে আলো জ্বেলে দরজা খোলে। ঘরে ঢুকে সোমেন বলল—লেটারবক্স খোল নি আজ? দেখে মনে হচ্ছে চিঠি এসেছে।

চাবি নিয়ে সোমেন বেরিয়ে যায়। ফিরে আসে চিঠি হাতে। বলে সে—তোমার মা'র একখানা চিঠি আর...

—কই দেখি? মা'র চিঠিখানা আগে দাও। ঝট্‌পট ইনল্যান্ডের মুখ খোলে আয়তী। লিখেছেন লীলাময়ী—স্নেহের মা আয়তী অনেকদিন হল তোর চিঠি পেয়েছি। উত্তর দিতে দেরী হল বলে কিছু মনে করিস না। বয়স কাউকে ক্ষমা করে না। আজকাল লিখতে গেলে হাত কাঁপে। যাক্ যা বলতে চাই। মনুষ্যজীবন বড়ই দুর্লভ। মানসিক স্তব্ধতা থেকে মুক্তিলাভের জন্য তুই যা অর্জন করবার প্রয়াস চালাচ্ছিস তা যবে থেকে জেনেছি তবে থেকে শান্তিতে আছি। আমার অভিজ্ঞতার ঝুলি ভর্তি। প্রকাশ করবার সুযোগ বা সময় কিছুই হয়ে উঠল না। দারিদ্রের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে আসল সময় চলে গেছে। এখন তোর মুখ চেয়ে আছি। হতাশাকে স্থান দিবি না। হেরে যেতে নেই। আত্মবিশ্বাস থাকলে কোন এক সময় জিতে যাবিই। কবির ভাষায় বলি—"একমনে তোর একতারাতে একটি যে তার সেইটি বাজা/ফুলবনে তোর একটি কুসুম, তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা।" আশীর্বাদিকা মা। সোমেন দাঁড়িয়ে আছে। বলল—তোমার নামে আর একটা চিঠি এসেছে।

—দিনবদলের পালা নিয়ে আজ মন উথালপাথাল হচ্ছিল বলেই হয়ত চিঠিটা নিতে গিয়ে সোমেনের দিকে নজর পড়ল। তার যুবক বয়সের টানটান চেহারা ঈষৎ ঝোঁকা। মুখে ক্লান্তির ছাপ খুব স্পষ্ট। যদিও উদাসীন তবুও সৎ কর্মনিষ্ঠ উদারহৃদয় লোকটির প্রতি শিরশিরে মায়াময় অনুভূতি শরীরের শিরায় শিরায় বহে যায়।

পোস্টকার্ডে লেখা চিঠি। কেমন যেন অন্যরকমের মনে হচ্ছে। ছাপার অক্ষরে লেখা। একবার পড়ল। দুবার পড়ল। তৃতীয়বার পড়তে পারল না। ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছে লেখাগুলো, বিশ্বাস হচ্ছে না। স্বপ্ন সত্যি হলে এত আনন্দ হয় নাকি? বিষাদসমুদ্রে সাঁতরাতে সাঁতরাতে এতদিনে সে কি দামী মুক্তো কুড়িয়ে পেল? চোখ ছাপিয়ে জল পড়ছে। হারিয়ে যাচ্ছে ভেসে যাচ্ছে তার চেতনা। এক ধরনের আচ্ছন্নভাব গ্রাস করে ফেলল আয়তীকে।

—খুব সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছ দেখছি। এতদিন চেষ্টার পর অত নামী পত্রিকায় তোমার গল্প ছাপা হচ্ছে—কনগ্র্যাচুলেশন আয়তী।

সোমেনের কথায় চমক লাগে। আচ্ছন্নভাব কেটে যায়। তাকিয়ে দেখল সে সোমেনের উদাসীন নির্বিকার মুখে অর্থবহ খুশীর হাসি। এক বাক্স মিষ্টি তার হাতে। কখন বেড়িয়ে গিয়ে সামনের দোকান থেকে সে মিষ্টি কিনে এনেছে টের পায় নি আয়তী।